ইলমুল কুরআন

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাকীমুল উম্মত
মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ)

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ইলমুল কুরআন

Reza Darul Ifta Society ★ Islampur College Road, Murshidabad
S/1L/No.98985
W.B
N6-65

মূল ঃ হাকীমুল উম্মত
মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশনায় ঃ

নিশান প্রকাশনী
আন্দরকিল্লা
চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল ঃ ১লা মার্চ ২০০২

পূণঃ মুদ্রণ ঃ- ১মার্চ, ২০০৬ ইং

হাদিয়া ঃ- ৮৫.০০ টাকা

সর্বস্বত্ত সংরক্ষিত

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মাওলানা এস.এম. মঈন উদ্দিন
আরবী প্রভাষক
পোমরা জামেউল উলুম মাদ্রাসা।

মুদ্রণে ঃ এনাম্‌স প্রিন্টার্স এন্ড কম্পিউটার
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬১৮৮৭৪

অনুবাদকের কথা

হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর বিরচিত 'ইলমুল কুরআন' গ্রন্থখানা বাংলায় অনুবাদ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং আল্লাহর কাছে লাখো শুকরীয়া জ্ঞাপন করছি। এক যুগ আগে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তৎকালীন উপ-পরিচালক মরহুম মাওলানা হাফেজ মঈনুল ইসলাম সাহেবের অনুপ্রেরনায় গ্রন্থখানা ফাউন্ডেশন থেকে অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছিল এবং সুধী পাঠক মহলের কাছে বেশ সমাদৃত হয়েছিল। কারণ বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই নেই বললেই চলে। বইটিতে একদিকে কুরআনের অনুবাদক ও অনুবাদপাঠকদের জন্য সঠিক পথ নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে বাতিলপন্থীদের মনগড়া তফসীর ও ভ্রান্ত অনুবাদের খোলস উম্মোচন করা হয়েছে। তাই বইটি বাজারে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে বইটি ফুরিয়ে যায়। কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্য, এক যুগ পার হয়ে যাওয়ার পরও বইটি পুন: মুদ্রন করা হয়নি।

মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী সাহেবের অধিকাংশ গ্রন্থ আমাদের প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হওয়ায় পাঠক মহল 'ইলমুল কুরআন' গ্রন্থখানাও আমাদের প্রকাশনী থেকে বের করার জন্য অনবরত তাগাদা দিতে থাকে। ক্রমবদ্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে গ্রন্থখানা নতুনভাবে অনুবাদ করে পাঠক মহলের খেদমতে পেশ করলাম।

আশা করি বইটি পাঠে পাঠকমহল বিশেষ উপকৃত হবেন এবং বাতিলপন্থীদের খপ্‌পর থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। আমীন।

১লা মার্চ, ২০০২ ইং

অনুবাদক

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচী

বিষয়ঃ পৃষ্ঠা

☆ ভূমিকা ঃ ---------- ১
∞ বর্তমান যুগের মুসলমানগনের মধ্যে কুরআনের অনুবাদ জানার আগ্রহ- -------- ২
∞ কুরআনের অনুবাদে জটিলতা সমূহ- ---------- ৫
☆ পেশ কালাম ঃ ---------- ৮
∞ কুরআনের আয়াত সমূহের প্রকারভেদ- ---------- ৮
∞ কুরআনের তাফসীর করার পদ্ধতি- ---------- ৯
☆ কুরআনী পরিভাষা সমূহ ঃ ---------- ১৭
∞ ঈমান- ---------- ১৭
∞ ইসলাম- ---------- ২১
∞ তাকওয়া- ---------- ২৩
∞ কুফর- ---------- ২৭
∞ শিরক- ---------- ৩১
∞ বিদআত- ---------- ৪৫
∞ ইলাহ ---------- ৪৬
∞ ওলী ---------- ৬১
∞ দুআ ---------- ৭০
∞ ইবাদত ---------- ৭৫
∞ গায়রুল্লাহ ---------- ৮০
∞ নযর-নিয়ায ---------- ৮৬
∞ সর্বশেষ নবী ---------- ৯১
☆ কুরআনী কায়দা-কানুন ঃ ---------- ৯১
∞ কায়দা নং ১ - ওহী শব্দের অর্থ ও পরিচয়- ---------- ৯১
∞ কায়দা নং ২ - আব্‌দ শব্দের বিশ্লেষন ---------- ৯২
∞ কায়দা নং ৩ - রব শব্দের অর্থ- ---------- ৯৩
∞ কায়দা নং ৪ - দলাল শব্দের বিশ্লেষন ---------- ৯৪
∞ কায়দা নং ৫ - মকর শব্দের বিশ্লেষন ---------- ৯৫
∞ কায়দা নং ৬ - তাকওয়া শব্দের বিশ্লেষন ---------- ৯৬
∞ কায়দা নং ৭ - গায়রুল্লাহর পরিচয় - ---------- ৯৬
∞ কায়দা নং ৮ - ওলী শব্দের অর্থ- ---------- ৯৮
∞ কায়দা নং ৯ - দুআর অর্থ - ---------- ৯৯
∞ কায়দা নং ১০ - শিরকের অর্থ ---------- ১০০
∞ কায়দা নং ১১ - সালাতের অর্থ - ---------- ১০১
∞ কায়দা নং ১২ - মৃতগণের শ্রবণ শক্তি- ---------- ১০২
∞ কায়দা নং ১৩ - ঈমান ও তাকওয়া ---------- ১০৪
∞ কায়দা নং ১৪ - খলক শব্দের অর্থ- ---------- ১০৫
∞ কায়দা নং ১৫ - হুকুম, সাক্ষ্য, মালিকানার অর্থ- ---------- ১০৬
∞ কায়দা নং ১৬ - ইলমে গায়েবের বিশ্লেষন- ---------- ১০৮
∞ কায়দা নং ১৭ - শাফায়াতের বর্ণনা- ---------- ১১০
∞ কায়দা নং ১৮ - গায়রুল্লাহকে ডাকার প্রকারভেদ- ---------- ১১২
∞ কায়দা নং ১৯ - বান্দাকে সাহায্যকারী মনে করা– ---------- ১১৩
∞ কায়দা নং ২০ - উসীলার তারতম্য- ---------- ১১৫
∞ কায়দা নং ২১ - একের কর্ম অন্যের উপকারে আসা- ---------- ১১৫
∞ কায়দা নং ২২ - অপরের বোঝা বহন- ---------- ১১৭
∞ কায়দা নং ২৩ - রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য - ---------- ১১৮
∞ কায়দা নং ২৪ - স্বীয় পরিনাম সম্পর্কে হুযূরের অবগতি- ---------- ১২০
∞ কায়দা নং ২৫ - নবীর হেদায়েত- ---------- ১২২
∞ কায়দা নং ২৬ - গায়রুল্লাহের নামে সম্বোধিত পশু- ---------- ১২৪
∞ কায়দা নং ২৭ - নবী কল্যান - অকল্যান করার মালিক- ---------- ১২৫
∞ কায়দা নং ২৮ - উথোলন প্রসঙ্গ- ---------- ১২৬
∞ কায়দা নং ২৯ - খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে ভয় করা- ---------- ১২৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

- কায়দা নং ৩০ - নবী আমাদের মত মানুষ নন- ---------- ১৩১
- ☆ কুরআনী মাসায়েল ঃ ---------- ১৩৪
- মাস্‌আলা নং ১ - আল্লাহর ওলীগনের কারামত হক- ---------- ১৩৪
- মাস্‌আলা নং ২ - আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ আল্লাহর অনুমতিতে মুশকিল আসানকারী, হাজত পূর্ণকারী ও বালা মুসিবত দমনকারী- ---------- ১৩৭
- মাস্‌আলা নং ৩- আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের মুখ থেকে যা বের হয়, তা বাস্তবে পরিণত হয়- ---------- ১৪১
- মাস্‌আলা নং ৪ - আল্লাহর প্রিয় বান্দাগন দূর থেকে দেখেন ও শুনেন- -----১৪৫
- মাস্‌আলা নং ৫ - মৃত ব্যক্তিগণ শুনেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ মৃত্যুর পরও সাহায্য করেন- ---------- ১৫১
- মাস্‌আলা নং ৬ - নেয়ামত প্রাপ্তির ঐতিহাসিক তারিখ সমূহ পালন করা ও এতে আনন্দ প্রকাশ করা জায়েয– ---------- ১৫৭
- মাস্‌আলা নং ৭ - বুজুর্গানে কিরামের আস্তানার তাজিম বরকত ময় - --------১৬০
- মাস্‌আলা নং ৮ - সত্য মযহাবের পরিচয়- ---------- ১৬২
- মাস্‌আলা নং ৯ - তাবিজ দুআ ও ঝাড়-ফুঁক জায়েয়- ---------- ১৬৫
- মাস্‌আলা নং ১০ - সকল সাহাবায়ে কিরাম বরহক- ---------- ১৬৭
- মাস্‌আলা নং ১১ পিতা বিহীন হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জন্ম- ---১৭৪
- একটি আপত্তির জবাব- ---------- ১৭৮

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَاَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۞

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সাধারণ মুসলমানগণ কেবল সওয়াবের নিয়তে কুরআন করীম তেলাওয়াত করতেন এবং খুবই কষ্ট করে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসায়েল- যেমন পাক-নাপাক, রোযা-নামায ইত্যাদির নিয়ম-কানুন শিখতেন। তাঁরা কুরআন শরীফের অনুবাদ করাকে খুবই ভয় করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে এটা অথৈ সাগর; এতে সেই ডুব দিতে পারে, যে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আনাড়ী কেউ এতে ঝাঁপ দেয়া মানে নিজেকে মৃত্যুর দুয়ারে সপে দেয়া। অনুরূপ যথাযত জ্ঞান ও বোধশক্তি ব্যতীত কুরআনের অনুবাদে হাত দেয়া মানে নিজের ঈমানকে ধ্বংস করা। তাছাড়া সাধারণ মুসলমানগণ জানতেন যে কবরে বা হাশরে কুরআনের অনুবাদ নিয়ে কোন প্রশ্ন করা হবে না, প্রশ্ন করা হবে ইবাদত ও অন্যান্য কাজ কর্ম সম্পর্কে। তাই তাঁরা সে মতে জীবন যাপন করতেন। এতো গেল সাধারণ লোকদের কথা, যারা আলেম-ফাযেল ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যারা কুরআন করীমের অনুবাদ করার মনস্থ করতেন, তাঁরা খুবই কষ্ট করে একুশটি বিষয় যেমন- আরবী শব্দ বিন্যাস, ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, অভিধান, যুক্তি বিদ্যা, দর্শন, গণিত,জ্যামিতি, ফিকাহ, তফসীর, হাদীছ, আকাইদ, ভূগোল, ইতিহাস, তাসাউফ, উছুলে ফিকাহ ইত্যাদি আয়ত্ত করতেন। এ সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে তাঁরা জীবনের যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করতেন। আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে উল্লেখিত বিষয়ে পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জনের পরই তাঁরা কুরআনের অনুবাদে মনোনিবেশ করতেন। তবে আয়াতে মুতাশাবিহাতে হাত লাগাতেন না। কারণ এ সব আয়াত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর গোপন সংলাপ। সেখানে অন্যদের মাথা ঘামানোর অবকাশ নেই। জনৈক ফারস্য কবি সুন্দর বলেছেন–

میان طالب ومطلوب رمزیسب

کراما کاتبیں راہم خبر نیست!

অর্থাৎ আশেক-মাশুকের ভাবের আদান প্রদান সম্পর্কে দু'কাঁধে অবস্থিত ফিরিশতাদ্বয়ও অবগত নন।

তাঁরা শুধু আয়াতে মুহকামাতের (স্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত) তরজুমা করতে চেষ্টা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করতেন উল্লেখিত বিষয় সমূহের আলোকে। তা ছাড়া মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণের দিক নির্দেশনাকে সামনে রাখতেন। এত কিছুর পরও তাঁরা কুরআন করীমের সামনে নিজেদেরকে একেবারে নগন্য মনে করতেন। ফলে মুসলমানগণ বদ মযহাব ও ধর্মহীনতার শিকার থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁরা জানতেন না কাদিয়ানী কোন্ মসীবতের নাম, দেওবন্দী কোথাকার ভূত, লা-মযহাবী ও প্রকৃতিবাদী কোন্ আপদ, এবং চকড়ালবী কোন্ জানোয়ারের নাম। ওলামায়ে কিরামের ওয়াজ নসীহত ছিল খোদা ভীতি, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শান মান, দীনি মাসায়েল ও জ্ঞান গর্ব আলোচনায় ভরপুর। ওয়াজ শ্রবণকারীগণ ওয়াজ শুনার পর দীনি মাসআলা সমূহ পরস্পর মিলে এমন ভাবে শিখতেন, যেমন আজকাল মাদ্রাসার ছাত্ররা ওস্তাদের কাছে সবক পড়ার পর নিজেরা এক সাথে বসে পুনঃ পাঠ করে। মোট কথা তখন অপূর্ব নুরানী যুগ ছিল এবং লোকগুলোও ছিল অপূর্ব নুরানী প্রকৃতির। হঠাৎ যুগের রং বদলে গেল, বাতাসের দিক পরিবর্তন হয়ে গেল, কতেক অজ্ঞ বন্ধু ও বন্ধুরূপী দুশমন সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে কুরআনের অনুবাদ করার ও শিখার উম্মাদনা সৃষ্টি করলো এবং সাধারণ লোকদেরকে বুঝালো যে কুরআন জন সাধারনেরই হেদায়েতের জন্য এসেছে। এটা বুঝা খুবই সহজ। যে কেউ স্বীয় জ্ঞান ও বোধ শক্তি দ্বারা এর অনুবাদ করতে পারে এবং হুকুমাদি বের করতে পারে। এর জন্য বিশেষ জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নেই। ফলে আওয়ামদের মধ্যে এ ধারণা বিস্তার লাভ করলো যে তারা কুরআন করীমকে মামুলি কিতাব এবং সাহেবে কুরআন (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে সাধারণ মানুষ মনে করে যাচ্ছে তা কুরআনের অনুবাদ করতে শুরু করলো এবং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শান মানকে অস্বীকার করে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নিয়ে এলো।

এখন অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা আরবী অভিধান থেকে কয়েক শব্দ মুখস্থ করে খুবই গর্ব সহকারে কুরআনের অনুবাদ করছে এবং যা কিছু ওদের বুঝে আসতেছে, সেটাকে ঐশী বাণী বলে প্রকাশ করছে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে নিত্য নতুন ফেরকা সৃষ্টি হচ্ছে এবং একে অপরকে কাফির মুশরিক, মুরতেদ ইত্যাদি বলছে।

জনৈক প্রধান শিক্ষক একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেয়ার সময় এক পর্যায়ে বলেন, যিনি কোরআনের অর্থ বুঝে না, ওনার নামায পড়া অনুচিত। কারণ আবেদনকারী যদি আবেদন পত্রে কি আছে তা না জানে, তাহলে আবেদনই বৃথা।' আমি বললাম, তাহলে আরবী ভাষায় নামায পড়ার কি দরকার? বর্তমান যুগের বাইবেলের মত কুরআনের অনুবাদ করে এর একটি সার সংক্ষেপ তৈরী করুন এবং সেটা দিয়ে নামায পড়ুন। আল্লাহ তা'আলা তো সব ভাষা বুঝেন।'এটা বলার পর উনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

আজকাল প্রতিটি বদমযহাবই কুরআনের অনুসারী বলে দাবী করে এবং মানুষকে কুরআনের দিকে আহ্বান করে। এ ফিতনার যুগ সম্পর্কে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বানী করে গেছেন। এ সব দাজ্জাল সম্পর্কে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন– يَدْعُوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ (তারা প্রত্যেককে

আল্লাহর কুরআনের দিকে ডাকবে।) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান :

وَاِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا

মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার আয়াত সমূহের উপর অন্ধ ও বধিরের মত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে না।

কানপুরে একটি বদমযহাব সৃষ্টি হয়েছিল। জনৈক আযিয আহমদ 'শাহনায়ে শরীয়ত' নামে একটি মাসিক ম্যাগাজিন বের করে এতে নিয়মিত লিখতো যে, সকল নবীগণ আগে মুশরিক, পাপী ছিলেন। মাযাল্লা, ওনারা দুষ্কর্মকারী ছিলেন। পরে তওবা করে ভাল হয়েছেন। সে নিম্নের আয়াত গুলো দলীল হিসেবে পেশ করতো ঃ

আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেছেন- وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى (আদম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর নাফরমানী করেছেন। তাই গোমরাহ হয়ে যান।) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বলেছেন : وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى (আল্লাহ তোমাকে গোমরাহ পেয়েছেন।) পরে তিনি হেদায়েত করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) চাঁদ, নক্ষত্র, সূর্যকে প্রভূ বলেছেন, যা শিরক। যেমন– فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ (যখন সূর্যকে উদিত দেখলেন, তখন বললেন এটাই আমার প্রভূ।) হযরত আদম ও হাওয়া সম্পর্কে বলেছেন– فَجَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا (তাঁরা উভয়ে স্বীয় সন্তানকে আল্লাহর শরীক বলে ধরে নিয়েছেন।) ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেছেন- وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا – لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ (অর্থাৎ নিশ্চয়ই জোলেখা ইউসুফের প্রতি এবং ইউসুফ জোলেখার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যদি আল্লাহর নিদর্শন না দেখতো, তাহলে অপকর্ম করে বসতো।) সে আরও লিখেছিল যে মহিলার প্রতি কুদৃষ্টিতে দেখা এবং কুকর্ম করার ইচ্ছা পোষন করা বড় খারাপ কাজ, যা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) থেকে প্রকাশ পেয়েছে। হযরত দাউদ (আলাইহিস সালাম) আউরিয়ার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে আউরিয়াকে হত্যা করায়ে ছিলেন। ওর মতে আদম (আলাইহিস সালাম) ও ইবলিসের একই রকম গুনাহ হয়েছিল এবং শাস্তিও একই রকম পেয়েছিল। ইবলিসকে বলা হলো - فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ (তুমি জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও, তুমি বহিষ্কৃত।) আদম (আলাইহিস সালাম) কে বলা হলো قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا (আমি বললাম, তোমরা এখান থেকে বের হয়ে যাও।) মোট কথা, উভয়কে দেশান্তরের শাস্তি দিয়েছেন। তাবে আদম (আলাইহিস সালাম) পরে তওবা করেছেন। কিন্তু ইবলিস তওবা করেনি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি সেই মুরতাদের ভ্রান্ত ধারণার অনেক উত্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু সে কিছুই মানতে রাজি ছিলনা। তার কথা হলো 'আমি কুরআন দ্বারা দলীল দিচ্ছি। এর জবাবে কোন বুজুর্গ, আলেম, সূফীর উক্তি বা হাদীছ মান্‌তে প্রস্তুত নই'।

শেষ পর্যন্ত আমি ওর কাছে জানতে চাইলাম যে আল্লাহ তাআলা নির্দোষ কি না? সে উত্তরে জানালো যে নিশ্চয়ই আল্লাহ দোষ মুক্ত। তখন আমি ওকে বললাম, কুরআনে বর্ণিত আছে যে আল্লাহর মধ্যেও দোষ আছে, আল্লাহ কয়েকজন এবং আল্লাহর দাদাও আছে। যেমন কুরআনে আছে- وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ - وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ (কাফিরেরা ধোঁকাবাজী করেছে। আল্লাহও ধোঁকাবাজী করেছে। আল্লাহ বড় ধোঁকাবাজ। (মা জাল্লা)।) অন্যত্র বর্ণিত আছে يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (তারা আল্লাহকে ধোঁকা দেয় এবং আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকা দেয়।) দেখুন, ধোঁকাবাজী, চালবাজী হচ্ছে ১নং পর্যায়ের দোষ। অথচ কুরআনে তা আল্লাহর বেলায় প্রমানিত আছে। কুরআনে বর্ণিত আছে - وَتَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا (আমাদের আল্লাহর দাদা হলেন বড় খানদানী।) এতে আল্লাহর দাদা আছে বলে প্রমানিত হলো। কুরআনের আর এক জায়গায় বর্ণিত আছে- فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ (আল্লাহ মহাপ্রাচুর্যময়, যিনি সমস্ত সৃষ্টিকর্তাদের থেকে উত্তম।) এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে সৃষ্টিকর্তা অনেক আছে।

আমি যখন এভাবে কুরআনের শাব্দিক অর্থ করে ওকে দেখালাম, তখন সে নিশ্চুপ হয়ে গেল। এরপর থেকে লেখালেখি বন্ধ হয়ে যায়। ওর সাথে আমার যে তর্ক বিতর্ক হয়েছিল, সেটা আমি 'কহরে কিবরিয়া বর মনকিরাতে আম্বিয়া' নামে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছি, যা পরবর্তীতে আমার রচিত 'জাআল হক' গ্রন্থে পরিশিষ্ট হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুয়াতের দাবী করলো এবং স্বীয় দাবীর সমর্থনে কুরআনের এ আয়াত পেশ করলো- اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ। (আল্লাহ ফিরিশতা ও মানব জাতি থেকে নবী রসূল বাছাই করতে থাকবেন।) অর্থাৎ নবী-রসূলের আগমন অব্যাহত থাকবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরণের মনগড়া তরজুমা করা বেঈমানীর মূল। চোখে পট্টি বেঁধে যা খুশি বল এবং কুরআন দ্বারা প্রমান করে দাও।

সম্প্রতি 'জাওয়াহেরুল কুরআন' নামে একটি কিতাব আমার চোখে পড়েছে। গোলাম উল্লাহ খান নামে কোন এক ধর্মদ্রোহী এ কিতাবটি লিখেছে। সে কুরআনের মনগড়া তরজুমা করে সম্পর্কিত আয়াতসমূহ নবীগণের বেলায় এবং কাফিরদের সম্পর্কিত আয়াতসমূহ মুসলমানগণের উপর প্রয়োগ করে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা

করেছে যে দুনিয়ার সকল আলেম, সূফী, মুমিন ও নেক বান্দাগণ মুশরিক ছিলেন। তার কথা মতে সে ও তার বংশধরই একমাত্র তওহিদী মুসলিম।

বুখারী শরীফের ২য় খন্ড بَابُ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِيْنَ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شَرَارَ خَلْقِ اللّٰهِ وَقَالَ اِنَّهُمُ انْطَلَقُوْا اِلٰى اٰيَاتٍ نُزِلَتْ فِى الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

(অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাদি আল্লাহু আনহুমা) ওসব খারেজী ধর্মদ্রোহীদেরকে আল্লাহর মখলুখের মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট মনে করতেন এবং বলতেন- ওসব ধর্মদ্রোহীরা কাফিরদের বেলায় নাযিলকৃত আয়াতসমূহ মুসলমানগণের উপর প্রয়োগ করেছে।) জাওয়াহেরুল কুরআনের সেই লেখক একই পদ্ধতি অনুসরন করেছে। কুরআনের মনগড়া তরজুমা এমন মারাত্মক, যা ঈমান সংহারক।

কুরআনের অনুবাদে জটিলতাসমূহ

কুরআন শরীফ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। আরবী ভাষা খুবই সমৃদ্ধ ভাষা। আরবী ভাষায় একটি শব্দের কয়েক অর্থ হয়ে থাকে। যেমন وَلِىٌّ শব্দের অর্থ বন্ধু, নিকট, সাহায্যকারী, মাবুদ, হেদায়েতকারী, উত্তরাধিকারী, মালিক। এ শব্দটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি এক জায়াগার অর্থ অন্য জায়গায় করা হয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে কুফরী বর্তায়। আবার এক অর্থবোধক শব্দও বিভিন্ন শব্দের সাথে মিলে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। যেমন شَهَادَتٌ শব্দের অর্থ সাক্ষ্য। এ শব্দটি যদি عَلٰى অব্যয়ের সাথে আসে, তাহলে বিপক্ষে সাক্ষ্য দানের অর্থ বুঝায়, যদি لام অব্যয়ের সাথে আসে,তাহলে পক্ষে সাক্ষ্য দানের অর্থ বুঝায়। অনুরূপ قَالَ শব্দের অর্থ হলো-'বলেছে'। যদি এ শব্দটি لام অব্যয়ের সাথে আসে, তাহলে অর্থ হবে 'ওকে বলেছে' আর যদি فِىْ অব্যয়ের সাথে আসে, তাহলে অর্থ হবে 'ওর সম্পর্কে বলেছে' এবং যদি مِنْ অব্যয়ের সাথে আসে, তাহলে অর্থ হবে 'ওর পক্ষ থেকে বলেছে'। এ রকম دُعاء শব্দটি কুরআনে ডাকা, আহবান করা, প্রার্থনা করা, পূজা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ دعا শব্দটা প্রার্থনা ও দোয়া অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সময় যদি لام অব্যয়ের সাথে আসে, তাহলে এর অর্থ হবে 'ওকে দুআ করেছে' আর যদি عَلٰى অব্যয়ের সাথে আসে, তখন অর্থ হবে 'ওকে বদ দুআ করেছে'।

অনুরূপ আরবীতে ب، عن، من، لام সবগুলোর অর্থ 'হতে'। কিন্তু এ সবের প্রয়োগের স্থান ভিন্ন ভিন্ন। যদি এ পার্থক্য জানা না থাকে, তাহলে অর্থ বিকৃত হয়ে যাবে। তার পরেও আরবের বাগধারা, উপমা ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মোট কথা পরিপূর্ণ জ্ঞান ছাড়া অনুবাদ করা মোটেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সাধারণ লোকেরা যদি কুরআনের অনুবাদে হাত দেয়, তাহলে অনুবাদের কি অবস্থা

হবে, তা বলার অবকাশ রাখে না। এ ধরণের অনুবাদের বরকতে আজ মুসলমানদের মধ্যে অনেক ফেরকার সৃষ্টি হয়েছে। এসব অনুবাদকারীরা এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, যে ওদের কৃত অনুবাদ মানে না, ওকে মুশরিক, মুরতেদ ও কাফির বলতে দ্বিধাবোধ করে না। সমস্ত আলিম ও নেকবান্দাকে কাফির সাব্যস্ত করে একমাত্র নিজেদেরকে ইসলামের সোল এজেন্ট মনে করে। যেমন মওলভী গোলাম আলী খান স্বীয় গ্রন্থ জাওয়াহেরুল কুরআনের ১৪১ ও ১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে-'যে ব্যক্তি নবী, ওলী, পীর, ফকীরকে মসীবতের সময় ডাকে, সে কাফির, মুশরিক এবং ওর বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উক্ত গ্রন্থের ১৫২ পৃষ্ঠায় লিখেছে যে, পীর ওলীর নামে নযর-নিয়ায শিরক এবং এগুলো খাওয়া শূকর খাওয়ার মত হারাম। এ ফত্ওয়ার দ্বারা সমস্ত মুসলমান বরং স্বয়ং দেওবন্দীদের গুরুরাও মুশরিক হয়ে গেছে। এমন কি গ্রন্থকার নিজেও বাদ পড়েনি।

গুজরাটের এক ব্যক্তি মওলভী গোলাম উল্লাহ খানের কাছে জবাবী কার্ড সহ ডাক যোগে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন, 'আপনি আপনার কিতাবের অমুক পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, মসীবতের সময় পীরের নাম নিলে বিবাহ বলবৎ থাকে না এবং নযর-নিয়াতের খাবার শূকরের মত হারাম। কিন্তু আপনার বিশিষ্ট বন্ধু ও দেওবন্দীদের মান্যবর আলেম জনাব এনায়েতউল্লাহ শাহ সাহেব গুজরাটীর পিতা মওলভী জালাল শাহ সাহেব গেয়ারবী শরীফের তবরুক খেতেন এবং অন্যদেরকে খাওয়াতেন। আপনার মাতা-পিতাও নাকি গেয়ারবী শরীফের তবরুক খেতেন, অন্যদেরকে খাওয়াতেন। তাঁরা খতমে গাউছীয়া পড়তেন এবং এ কসীদাটি পাঠ করতেন

امداد کں امداد کں ازبحرغم ازاد کن

دردیں ودنیا شاد کں یاشیخ عبد القادر

অর্থাৎ হে শেখ আবদুল কাদের; আমাদেরকে সাহায্য করুন; শোক সাগর থেকে উদ্ধার করুন, আমাদেরকে দ্বীন দুনিয়ায় সফলকাম করুন।

আমার প্রশ্ন হলো 'ওনাদের বিবাহটা বলবৎ আছে কি না? যদি বিবাহ বলবৎ না থাকে, তাহলে নিশ্চয় আপনি অবৈধ সন্তান। তাছাড়া আপনার মতে গেয়ারবী শরীফের খাবার যেহেতু শূকরের ন্যায় হারাম, সেহেতু আপনার পিতা একে হালাল মনে করায় মুরতেদ হয়ে গেছে এবং মুরতেদের বিবাহ সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে যায়। তাই এখন আপনাদের বেলায় কি হুকুম বর্তাবে? আপনাদের পিছনে নামায জায়েয হবে কিনা?' এর উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এবং পাওয়া যাবে বলে আশা করাও যায় না। আরবী ভাষায় একটি কথা আছে مَنْ حَفَرَ لِاَخِيْهِ وَقَعَ فِيْهِ (যে অন্যের জন্য গর্ত খনন করে, সে গর্তে নিজে পতিত হয়।) অন্য মুসলমানদের বিবাহ তো পরে ভঙ্গ হবে, প্রথমে নিজের মা-বাপের বিবাহের খবর নিন। কোন ব্যক্তি যদি ওদের থেকে এ ব্যাপারে জবাব আদায় করতে পারে, আমি ওর কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

মোট কথা মনগড়া অনুবাদ সকল অনিষ্টের মূল। এর থেকেই কাদিয়ানী, প্রকৃতি বাদী, চকড়ালবী, লা-মযহাবী, ওহাবী, দেওবন্দী, মওদুদী, বাবী, বাহায়ী ইত্যাদি ফেরকার

সৃষ্টি হয়েছে। এসব ফেরকার উৎস মনগড়া অনুবাদ। এ ভয়াবহ অবস্থা দেখে আমার বিশিষ্ট বন্ধু হযরত সায়্যেদ আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাসুম শাহ সাহেব কিবলা কাদেরী জিলানী বেশ কয়েক বার এমন একটি কিতাব লিখার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন, যেটা কুরআনের অনুবাদ পাঠকদের জন্য পথ প্রদর্শকের কাজ দেয়; যেটাতে এমন নিয়ম কানুন, পরিভাষা, মাসায়েল বর্ণিত থাকবে, যা পাঠ করে অনুবাদ পাঠকগণ ধোঁকা থেকে রক্ষা পাবে। যেহেতু কাজটা বড় ছিল এবং আমিও নানা কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলাম, সেহেতু এ কাজটা খুবই ধীর গতিতে চলছিল। হঠাৎ এক রমযান মাসে আমার বিশিষ্ট বন্ধু গুজরাট ইদগাহের খতীব মাওলানা আহমদ হোসাইন সাহেব 'জাওয়াহেরুল কুরআন' নামক কিতাবটি নিয়ে আমার কাছে আসলেন এবং বললেন- আপনারা আরাম করছেন আর এদিকে বাতিলপন্থীরা মনগড়া কুরআনের অনুবাদ করে মুসলমানদেরকে গোমরাহ করছে। আমার মনে তখন এ ভাব সৃষ্টি হলো যে আমি মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বারগাহে ধর্না দিয়েছি। তাঁরই নামে জীবন ধারন করছি। আমি তাঁর দরজার নগন্য চৌকিদার। চৌকিদার যদি চোর আসতে দেখে অবহেলা করে, তাহলে সে অপরাধী। এ সময় আমার নিরব থাকাটা বাস্তবিকই অপরাধ। কালবিলম্ব না করে আল্লাহ তাআলার করুনা এবং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রহমতের উপর ভরসা করে এ কাজে মনোনিবেশ করলাম। এ কিতাবে তিনটি অধ্যায় থাকবে। প্রথম অধ্যায়ে কুরআন করীমের পরিভাষা সমূহের বিবরণ থাকবে। তাতে বর্ণিত হবে যে কোন্ শব্দ কোন্ জায়গায় কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরআনের কায়দা সমূহ বর্ণিত হবে। তাতে কুরআনের অনুবাদ করার নিয়ম নীতি পেশ করা হবে, যদ্বারা নির্ভুল অনুবাদ করা যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে কুরআনী মাসায়েল সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। বিশেষ করে ওসব মাসায়েল বর্ণিত হবে, যে গুলো নিয়ে দেওবন্দী-ওহাবীরা বিতর্ক করে এবং সাধারণ মুসলমানকে মুশরিক ও কাফির বলে। এ গুলো সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা হবে, যেন সবাই বুঝতে পারে যে এসব মাসায়েল কুরআনে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে এবং বিরোধীতাকারীরা ভুল অনুবাদ করে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। এ কিতাবের নাম **'ইলমুল কুরআন লেতরজুমাতিল ফুরকান'** রাখলাম। আল্লাহ তাআলার কাছে গৃহীত হওয়ার আশা পোষণ করছি। যে কেউ এ কিতাবটি পাঠে উপকৃত হলে আমি গুনাহগারের জন্য দুআ করবেন, যেন আল্লাহ তাআলা একে আমার গুনাহ সমূহের কাফ্ফারা ও পরকালের সম্বল করে দেন।

وَمَاتَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী
পৃষ্ঠপোষক - গাউছিয়া নঈমীয়া মাদ্রাসা, গুজরাট
২২ শে রমজানুল মোবারক
১৩৭১ হিজরী সোমবার

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

পেশ কালাম

কুরআনের তরজুমা করার আগে এ কায়দাগুলো স্মরণ রাখা প্রয়োজন–

কুরআনের আয়াত সমূহ তিন প্রকার। কতেক আয়াতের ভাবার্থ বিদ্যা-বুদ্ধির আওতা বহির্ভূত, যেখান পর্যন্ত মেধাশক্তি পৌছতে পারেনা। এ রকম আয়াতকে মুতশাবিহাত বলা হয়। এ গুলোর মধ্যে এমন কতেক আয়াত আছে, যার অর্থও বুঝা যায় না। যেমন– الر ، حم ، الم ইত্যাদি। এ গুলোকে মুকাতাতিয়াত বলা হয়। আর কতেক আয়াত আছে, যার অর্থ বুঝা যায় কিন্তু ভাবার্থ বুঝা যায় না। কেননা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন - فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ – يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ – ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ (তুমি যেদিকে মুখ করবে, সেদিকে আল্লাহর মুখ আছে- আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর-অতঃপর আল্লাহ আরশের উপর উপবেশন করলেন।)

দেখুন, وجه অর্থ মুখ يد অর্থ হাত এবং اِسْتَوٰى অর্থ উপবেশন। কিন্তু এ সব অর্থ আল্লাহর শানের উপযোগী নয়। তাই এ সব আয়াত মুতশাবিহাতের অন্তর্ভূক্ত। এ ধরণের আয়াতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রয়োজন, তবে ভাবার্থ বর্ণনা করা সমীচীন নয়। এ ধরণের আয়াতকে আয়াতে সিফাত বলা হয়।

কতেক আয়াত আছে, যে গুলো উপরোক্ত আয়াতগুলোর মত অস্পষ্ট নয়। কুরআনী পরিভাষায় এ ধরণের আয়াতকে আয়াতে মুহকামাত বলা হয়। যেমন করআন করীম ইরশাদ ফরমান–

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيْلِهٖ – وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيْلَهٗ اِلَّا اللّٰهُ

সৃষ্টিকর্তা তিনিই, যিনি আপনার উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। এর কিছু আয়াত স্পষ্ট অর্থবোধক, এ গুলো কিতাবের মূল। অন্য কতেক আয়াত হচ্ছে মুতশাবিহাত, যে গুলোর অর্থে অস্পষ্টতা রয়েছে। ঐ ধরণের লোক, যাদের মনে কুটিলতা রয়েছে, তারা আয়াতে মুতশাবিহাতের পিছনে ধাবিত হয়ে ফিতনা করতে চায় এবং মনগড়া ব্যাখ্যা করতে চায়। অথচ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই এ ধরনের আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা জানেন।

আয়াতে মুহকামাতের মধ্যে কতেক আয়াতের অর্থ একেবারে পরিস্কার ও সুস্পষ্ট, যেটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। যেমন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (বলে দিন, তিনি আল্লাহ, তিনি এক।) এ ধরণের আয়াতকে নসুসে কতয়ী (অকাট্য দলীল) বলা হয়। আর কতেক আয়াত আছে, যে গুলো মুতশাবিহাতের মত রহস্যাবৃত নয়, আবার নসুসে কতয়ীর মত এমন সুস্পষ্টও নয় যে চিন্তা ভাবনা ছাড়া বুঝা সম্ভব। এ ধরণের আয়াতের তফসীর প্রয়োজন। তফসীর ছাড়া এ ধরণের আয়াতের অনুবাদ অনেক সময় বিপথগামীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তফসীর করার চারটি পদ্ধতি আছে – (১) কুরআনের দ্বারা কুরআনের তফসীর। কুরআনে এমন কতেক আয়াত আছে, যে গুলো অন্য আয়াতের তফসীর করে থাকে। (২) হাদীছ দ্বারা কুরআনের তফসীর। কেননা কুরআনকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যে রকম বুঝেছেন, অন্য কেউ সে রকম বুঝতে পারে না। (৩) সর্ব সম্মত রায় দ্বারা কুরআনের তফসীর - অর্থাৎ ওলামায়ে কিরাম যে ভাবার্থের উপর একমত হয়েছেন, সেটাই সঠিক। (৪) ধর্মীয় গবেষকগণের উক্তি দ্বারা কুরআনের তফসীর। এ চার প্রকারের তফসীরের মধ্যে প্রথম প্রকারের তফসীর সর্বোত্তম। কেননা যখন স্বয়ং বক্তা আল্লাহ তাআলাই নিজ বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, তখন অন্য দিকে ধাবিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। যদি পঞ্চাশটি আয়াতে একটি বিষয় কিছুটা অস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয় এবং একটি আয়াতে সেই বিষয়টির ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তাহলে এ আয়াতটি সেই পঞ্চাশ আয়াতের তফসীর হিসেবে ধরে নিতে হবে এবং সেই পঞ্চাশ আয়াতের ভাবার্থ সেটাই হবে, যেটা এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, আল্লাহ তাআলা কালামে পাকের অনেক জায়গায় আহলে কিতাবকে সম্বোধন করেছেন বা ওদের সম্পর্কে বলেছেন। যেমন-

قُلْ يَااَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَانَعْبُدَ اِلَّااللّٰهَ

বলে দিন, হে কিতাবধারীরা, এমন কলেমার দিকে এসো যেটা আমাদের ও তোমাদের কাছে বরাবর। আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো যেন ইবাদত না করি।

আহলে কিতাবের বর্ণনা কুরআনের অনেক জায়গায় আছে। কিন্তু এটা বুঝা যায় না যে কিতাব বলতে কোন্ কিতাবের কথা বলা হয়েছে এবং আহলে কিতাব বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা কুরআনকেও কিতাব বলা হয় এবং মানব রচিত ও আল্লাহ প্রেরিত গ্রন্থ গুলোকেও কিতাব বলা হয়। কুরআন নিজেই এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন– وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ তারা হলো, (তোমাদের আগে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে।) এ আয়াত ওসব আয়াতের ব্যাখ্যা করে দিল এবং বলে দিল যে হিন্দু বা শিখরা আহলে কিতাব নয়, ওদের কাছে আসমানী কিতাব নেই। মুসলমানকেও বুঝানো হয় নি। কেননা ঐ কিতাব দ্বারা আগের আসমানী কিতাব গুলোর কথা বলা হয়েছে। তাই আহলে কিতাব বলতে ইহুদী খৃষ্টান অর্থাৎ ইনজিল ও তৌরিতধারীদের বুঝানো হয়েছে।

কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (সোজা পথ) গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন কুরআনে বর্ণিত আছে وَهٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ (এটা আমার সোজা পথ, এর অনুসরণ কর; অন্য পথ সমূহের অনুসরণ কর না।)

কিন্তু এ সব আয়াতে সোজা পথ কোন্‌টি, তা বলা হয়নি। এ সব আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরআন বলেন- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত কর। তাঁদের পথে, যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ।)

এ আয়াতে ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে যে কুরআনের যে সব আয়াতে সোজা রাস্তার কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা সেই দীন ও মযহাবকে বুঝানো হয়েছে, যেটার উপর আল্লাহর ওলীগণ, ওলামায়ে কিরাম ও নেকবান্দাগণ অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রয়েছেন। নতুন ধর্ম ও মযহাব হলো বাঁকা পথ, যদিওবা সেই মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়ে প্রমাণ করে যে ওর মযহাব সঠিক। যেমন কাদিয়ানী, দেওবন্দী, শিয়া ইত্যাদি। অনুরূপ কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় গায়রুল্লাহকে (খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে) ডাকা বা আহবান করা নিষেধ করা হয়েছে এবং আহবানকারীদের উপর কুফর ও শিরকের ফত্ওয়া দেয়া হয়েছে। যেমন-

وَلَاتَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَايَنْفَعُكَ وَلَايَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ- وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ- وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ-

খোদা ভিন্ন এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি। তুমি যদি এ রকম কর, তাহলে জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। ওর থেকে বড় গোমরাহ আর কে আছে, যে গায়রুল্লাকে ডাকে। আগে যাদেরকে ডাকতো, ওরা অদৃশ্য হয়ে গেছে। তোমরা খোদা ভিন্ন যাদেরকে ডাক, ওরা সামান্য বাকলেরও মালিক নয়।

এ রকম বিশটি আয়াত আছে, যে গুলোতে খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে ডাকা নিষেধ করা হয়েছে বরং যারা ডাকে, তাদেরকে মুশরিক বলা হয়েছে। যদি এ আয়াতগুলোকে এ ভাবে শর্তহীন ভাবে রাখা হয়, তাহলে এ সব আয়াতের ভাবার্থ হবে উপস্থিত, অনুপস্থিত, জীবিত-মৃত কাউকে ডেকো না। কিন্তু এ রকম অর্থ কুরআনের আয়াতেরও বিপরীত এবং বিবেকেরও পরিপন্থী। স্বয়ং কুরআন ইরশাদ ফরমায়েছেন ঃ

اُدْعُوْاهُمْ لِاٰبَاۤئِهِمْ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرٰكُمْ - ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا

(১) ওদেরকে ওদের বাপ-দাদার নাম ধরে ডেকো। (২) এবং রসূল তোমাদেরকে পিছনের কাতারে ডাকতেন। (৩) হে ইব্রাহীম! অতঃপর জবেহকৃত প্রাণী গুলোকে ডেকো। ওগুলো তোমার কাছে দৌড়ে আসবে।

এ ধরণের বিশটি আয়াত আছে, যে গুলোতে জীবিত ও মৃতদেরকে ডাকার কথা বর্ণিত আছে। তাছাড়া আমরা দিনরাত একে অপরকে ডাকি। নামাযে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করে সালাম পেশ করি। যেমন- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ (হে নবী আপনার উপর সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত হোক।)

তাই এটা কুরআন শরীফে অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন যে নিষেধাজ্ঞার আয়াত সমূহে ডাকা বলতে কি বুঝানো হয়েছে। কুরআন শরীফ ওসব আয়াতের তফসীর এ ভাবে করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

(১) যে ব্যাক্তি আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদকে ডাকে, যার কোন প্রমাণ ওর কাছে নেই, ওর হিসেব ওর প্রভূর কাছে হবে।

(২) আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না।

এ আয়াত সমূহে বলা হয়েছে যে, যে সব আয়াতে গায়রুল্লাহকে ডাকা থেকে বারণ করা হয়েছে, সে সব আয়াতে খোদা মনে করে ডাকা বা আল্লাহর সাথে মিলায়ে ডাকা অর্থাৎ পুজা করা বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যা দ্বারা ওসব আয়াতের ভাবার্থ এমন পরিস্কার হয়ে গেছে যে এরপর আর কোন আপত্তি উথাপনের অবকাশ নেই। কুরআনে আরো বর্ণিত আছে-

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاۤئِهِمْ غٰفِلُوْنَ - وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ
اَعْدَاۤءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ-

ওর থেকে বড় গোমরাহ কে আছে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে ডাকে, যে গুলো কিয়ামত পর্যন্ত শুনবে না এবং ও গুলোর কাছে ওর ডাকার (পূজা) খবরও নেই এবং যখন মানুষের হাশর হবে তখন ওগুলো ওদের দুশমন হয়ে যাবে এবং ওদের ইবাদতের কথা অস্বীকার করবে। (পারা-২৬, রুকূ- ১, আয়াত-৪)

এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ডাকাকে ইবাদত বলা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে এ সব মূর্তি কিয়ামতের দিন ওসব মুশরিকদের ইবাদতের অর্থাৎ ডাকার অস্বীকারকারী হয়ে যাবে। এতে বুঝা গেল যে ডাকার দ্বারা এমন ডাকাকে বুঝানো হয়েছে যেটা ইবাদত হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ ইলাহ মনে করে ডাকা। এ জন্য প্রায় তফসীরকারকগণ খোদা ভিন্ন অন্যকে ডাকার নিষেধাজ্ঞার আয়াত সমূহে 'ডাকা' শব্দের অর্থ করেছেন- পূজা। যে সব ওহাবীরা নিষেধাজ্ঞার আয়াত সমূহে دعا শব্দের অর্থ 'ডাকা' করেছে এবং নিজ থেকে মনগড়া শর্তারোপ করে ডাকা মানে দূর থেকে ডাকা, কোন মাধ্যম ছাড়া শুনার ধারণা নিয়ে ডাকা বা মৃতদেরকে ডাকা বলেছে, তা একেবারে ভ্রান্ত ধারণা। প্রথমতঃ এসব শর্তারোপ কোরআনের কোথাও নেই, দ্বিতীয়তঃ এ ধরণের ব্যাখ্যা স্বয়ং কুরআনী ব্যাখ্যার বিপরীত, তৃতীয়তঃ নবীগণ, সাহাবীগণ মৃতদেরকেও ডেকেছেন এবং হাজার হাজার মাইল দূর থেকেও ডেকেছেন এবং সে ডাক শুনাও গেছে। (এ বিষয়ে কুরআনী মাসায়েল অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে) সুতরাং ওদের এ ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য।

কুরআন দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যার আর একটি উদহারণ দেখুন। আল্লাহ তাআলা কালামে পাকের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ওলী (সাহায্যকারী) মানতে নিষেধ করেছেন বরং খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে যে ওলী (সাহায্যকারী) সাব্যস্ত করে, ওকে গোমরাহ, কাফির, মুশরিক বলেছেন। যেমন ইরশাদ ফরমান–

مَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ - مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاۤءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ - اِتَّخَذَتْ بَيْتًا - وَاِنَّ اَوْهَنَ
الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ-

আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ওলী নেই, নেই কোন সাহায্যকারী। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ওলী বানায়, ওদের উদাহরণ মাকড়সার মত, যে জাল বুনেছে। নিশ্চয়ই সব ঘর থেকে দুর্বল ঘর হচ্ছে মাকড়সার। (সূরা- আনকাবুত, রুকু-১৫, আয়াত -৪০)

আরও বর্ণিত আছে–

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَاۤءَ اِنَّآ
اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا-

আপনি কি ধারণা পোষন করেন ওসব কাফিরদের সম্বন্ধে, যারা আমি ছাড়া আমার বান্দাদেরকে ওলী বানিয়েছে? আমি কাফিরদের জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি।

ওলী অর্থ বন্ধু, সাহায্যকারী মালিক ইত্যাদি। যদি এসব আয়াতে ওলী অর্থ সাহায্যকারী করা হয় এবং বলা হয় যে, যে খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সাহায্যকারী মনে করে, সে কাফির, মুশরিক, তাহলে সে অর্থ সুস্পষ্ট প্রমান ও যুক্তির বিপরীত হবে। সুস্পষ্ট প্রমাণের বিপরীত এ জন্য হবে যে স্বয়ং কুরআনে আল্লাহর বান্দাগণ সাহায্যকারী হওয়ার কথা উল্লেখিত আছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

فَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا-

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোন ওলী এবং সাহায্যকারী নির্ধারিত করে দিন।

আরও ইরশাদ ফরমান-

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ - وَالْمَلٰۤئِكَةُ بَعْدَ
ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ-

নবীর সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ, জিব্রাইল, নেক বান্দা, অতঃপর ফিরিশতাগণ।

আরও ফরমান–

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَهُمْ رَاكِعُوْنَ-

তোমাদের সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সেই মুমিন বান্দা, যে যাকাত দেয় ও নামায পড়ে।

আর ফরমান–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ-

মুমিন পুরুষ ও মহিলাগণ একে অপরের সাহায্যকারী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহর মুকাবিলায় পাবেনা কোন সাহায্যকারী, না সহযোগিতাকারী। (পারা-২১, সূরা- আহযাব, রুকু-১৭)

وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا

যার প্রতি আল্লাহ লানত করে, ওর কোন সাহায্যকারী নেই।

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ

যাকে আল্লাহ গোমরাহ করে দেন, এরপর ওর আর কোন সাহায্যকারী নেই।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আলাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী ও সহযোগিতাকারীর কথা অস্বীকার করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো ছাড়া এরকম আরও অনেক আয়াত আছে ,যেগুলোতে ওলী শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।

তিন, কাউকে সাহায্যকারী মনে করে পূজা করা অর্থাৎ ওলী শব্দটি মাবুদ অর্থে ব্যবহার করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান-

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ مَانَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَا – وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ.....

(১) যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা বলে যে আমরা তো ওদেরকে পূজা করি না। তবে এজন্য মান্য করি যে তারা আমাদেরকে যেন আল্লাহর নিকটতর করে দেয়। (২) এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদকে ডাকে না.....।

এ তিন রকম ভাবে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে সাহায্যকারী মনে করা কুফর ও শিরক। যারা এ রকমের সাহায্যকারী বিশ্বাস করে, তারা মুশরিক ও মুরতেদ।

চার, কাউকে আল্লাহর বান্দা মনে করে আল্লাহর অনুমতিতে সাহায্যকারী মনে করা এবং ওর সাহায্যকে আল্লাহর সাহায্য মনে করা । এ রকমের মনে করাটা দোষের নয়, একেবারে সঠিক ও হক। এ প্রসঙ্গের আয়াত একটু আগে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখিত আয়াত সমূহে ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে যে নিষেধাজ্ঞার আয়াতসমূহ দ্বারা প্রথম তিন প্রকারের সাহায্যকারীকে বুঝানো হয়েছে এবং জায়েযের আয়াত দ্বারা চতুর্থ প্রকারের সাহায্যকারীকে বুঝানো হয়েছে। সুবহানাল্লাহ, এ কুরআনী ব্যাখ্যা দ্বারা আর কোন আপত্তির অবকাশ রইলো না। কিন্তু ওহাবীরা এ ব্যাখ্যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বলে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্যকারী মনে করা শিরক। তাদের এ ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। প্রথমতঃ ওদের বক্তব্যটা মনগড়া, কুরআনে নেই। দ্বিতীয়তঃ ওদের এ অভিমত কুরআনী ব্যাখ্যার বিপরীত, যা আমি ইতোপূবে আরয করেছি। তৃতীয়তঃ আল্লাহর বান্দা

'আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্য কারী নেই' এ কথাটা যুক্তিরও বিপরীত। যুক্তির বিপরীত এ জন্য যে দীন-দুনিয়ার স্থিতি একে অপরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। যদি পরস্পরের সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে দীন-দুনিয়া কোনটাই আবাদ থাকবে না। তাই এ রকম প্রয়োজনীয় বিষয়কে আল্লাহ তাআলা কি করে শিরক বলতে পারেন। আসুন, এবার এ নিষেধাজ্ঞার ব্যাখ্যা কুরআনে খুঁজে দেখি। কুরআন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে কাউকে চার রকম ভাবে সাহায্য কারী মানা যায, যার মধ্যে তিন রকম কুফর ও শিরকের পর্যায় ভুক্ত এবং এক রকম সঠিক ঈমানের পর্যায়ভুক্ত।

এক, আল্লাহ তাআলাকে দুর্বল মনে করে অন্য কাউকে সাহায্যকারী মান্য করা। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করতে অপারগ। তাই অমুক আমাদেরকে সাহায্য করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا–

দুর্বলতার কারণে আল্লাহর কোন সাহায্যকারী নেই। তারই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষনা কর। (পারা-১৫, সূরা-বনী ইসরাইল, আয়াত-১১১)

দুই, আল্লাহর মুকাবিলায় অন্য কাউকে সাহায্যকারী মনে করা, যেমন আল্লাহ তাআলা আযাব দিতে চান কিন্তু অপর সাহায্যকারী এর থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

اُولٰئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ –

এ কাফিরেরা পৃথিবীতে আল্লাহকে কাবু করতে পারে না। আল্লাহর মুকাবিলায় ওদের অন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

اَلَا اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِىْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ

খরবদার! কাফিরেরা অনন্ত আযাবে আছে।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

ওদের কোন সাহায্যকারী হবে না, যে আল্লাহর মুকাবিলায় ওদেরকে সাহায্য করবে। (পারা-২৫, সূরা-শোরা, রুকু-৫, আয়াত-৪৪)

قُلْ مَنْ ذَالَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءً اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً-وَلَايَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَانَصِيْرًا–

বলেদিন, কে আছে, যে তোমাদেরকে আল্লাহর থেকে রক্ষা করতে পারে, যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল চান বা তোমাদের প্রতি করুনা করতে চান। ওরা

pdf By Syed Mostafa Sakib

খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সাহায্য করতে পারে। কুরআনী মাসায়েল অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ পেশ করা হবে। মোট কথা, ওদের এ মত বাতিল এবং কুরআনী তফসীর পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ। এ গেল কুরআনের দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যার কয়েকটি উদাহরণ।

এবার হাদীছের দ্বারা কুরআনে ব্যাখ্যা দেখুন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ ফরমান–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ ফরমান–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্ব ফরয করা হয়েছে, যে ওখান পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষমতা রাখে।

এ গুলো ছাড়া আহকামের সমস্ত আয়াতগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের প্রয়োজন। কুরআন করীমে এ সব আয়াতের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা নেই। নামাযের সময়, রাকাতের সংখ্যা, যাকাতের পরিমান, যাকাতের শর্ত সমূহ, রোযার ফরয সমূহ, বর্জনীয় বিষয় সমূহ, হজের শর্ত ও রোকন সমূহ ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়নি। এ সব আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য আমরা হাদীছের সাহায্য নিয়েছি এবং বিস্তারিত ভাবে হাদীছ থেকে জেনেছি। মোট কথা, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ আয়াতসমূহের কেবল অনুবাদ অর্থহীন, এমনকি বিপজ্জনক। আর আয়াতের ব্যাখ্যা কেবল নিজের মনগড়া রায় বা অভিমত দ্বারা হতে পারে না। আমি এ কিতাবে কুরআনের অনুবাদ করার নিয়ম-কানুন, কতেকগুলো কুরআনী জরুরী মাসায়েল এবং কুরআন করীমের কিছু প্রয়োজনীয় পরিভাষা বর্ণনা করবো। প্রত্যেক কিছুর ব্যাখ্যা স্বয়ং কুরআন শরীফ থেকে পেশ করবো। তবে এর সমর্থনে কোন হাদীছ পেশ করলেও তা কুরআনের আলোকে করা হবে। কেননা আজ কাল এ ধরণের প্রমানাদি মুসলমানগণ পছন্দ করে এবং এ গুলোর সাথে অধিক পরিচিত। তাই যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিষয়ে কলম ধরলাম।

প্রথম অধ্যায়

কুরআনী পরিভাষাসমূহ

কুরআন শরীফে কতেক শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি সেই অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ করা হয়, তাহলে কুরআনের উদ্দেশ্য পরিবর্তন অথবা ব্যাহত হয়ে যায়। তাই কুরআনের পরিভাষাসমূহ ভালমতে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যেন অনুবাদে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়।

ايمان – ঈমান

ايمان(ঈমান) امن(আমন) থেকে গঠন করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ নিরাপত্তা দেয়া। শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান হলো আকাইদ বা বিশ্বাসের নাম, যা গ্রহণ করার দ্বারা মানুষ স্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা পাবে। যেমন- তাওহীদ, রেসালত, হাশর-নশর, ফিরিশতা, জান্নাত-দোযখ তকদীর ইত্যাদি বিশ্বাস করা, যার কিছু বর্ণনা নিম্নের আয়াতে আছে–

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

সকল মুমিন আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং রসূলগণের উপর ঈমান এনেছে এবং তারা বলে যে আমরা আল্লাহর রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করি না।

কিন্তু কুরআনী পরিভাষায় ঈমানের মূল হলো বান্দা মনে প্রাণে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে স্বীয় হাকিম মনে করা এবং নিজেকে তাঁর গোলাম স্বীকার করা। এটার উপর সমস্ত আকাইদ নির্ভরশীল। মুমিনের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি সব হুযূরের কর্তৃত্বাধীন এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সমস্ত মখলুক থেকে অধিক ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী। যদি তাঁকে মানা হয়,তাহলে তাওহীদ, কিতাব সমূহ, ফিরিশতা ইত্যাদি সব কিছু মানা হলো আর যদি তাঁকে মানা না হয়, তাহলে তাওহীদ, ফিরিশতা, হাশর-নশর, জান্নাত-দোযখ ইত্যাদি সব কিছু মানলেও কুরআনের ফত্ওয়ায় সে মুমিন নয়, বরং কাফির ও মুশরিক। ইবলিসপরিপূর্ণ একত্ববাদী, নামাযী,

pdf By Syed Mostafa Sakib

সিজদাকারী ছিল, ফিরিশতা, কিয়ামত, জান্নাত-দোযখ ইত্যাদি বিশ্বাস করতো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ (শয়তান কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত।) কেননা সে নবীর শানমানের বিশ্বাসী ছিল না। মোট কথা, কুরআনের মতে মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শানমানের প্রতি আস্থা রাখার উপর ঈমান নির্ভরশীল। নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহে এ পরিভাষাই প্রকাশ পায় ঃ

(১) فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

হে মাহবুব, তোমার রবের কসম! এ সমস্ত তওহীদপন্থী ও অন্যান্য লোকেরা ঐ সময় পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত তোমাকে তাদের সমস্ত ঝগড়া বিবাদে হাকিম মান্য না করে, তোমার রায়ে মর্মাহত বোধ করে এবং সন্তুষ্টি চিত্তে গ্রহণ না করে।

(২) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ-

লোকদের মধ্যে কতেক ঐ রকম (মুনাফিক) লোকও আছে, যারা বলে- আমরা আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর ঈমান এনেছি কিন্তু তারা মুমিন নয়।

দেখুন, অধিকাংশ মুনাফিক ইহুদী ছিল, যারা খোদার সত্ত্বা, গুনাবলী, কিয়ামত ইত্যাদি বিশ্বাস করতো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওদেরকে কাফির বলেছেন। কেননা তারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে মানতো না। তারা আল্লাহ ও কিয়ামতের নাম নিল কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নাম নিল না। তাই আল্লাহ তাআলা ওদেরকে মুমিন বলে স্বীকার করলেন না।

(৩) اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ-

যখন আপনার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন তারা বলে- আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহও জানেন যে আপনি তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা মিথ্যুক।

জানা গেল যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে কেবল মৌখিক ভাবে মামুলী তরিকায় মেনে নেয়ার দাবী করাটা মুমিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। ওনাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করার নাম ঈমান। সুবহানাল্লাহ! কথা সত্য কিন্তু কথক মিথ্যুক। কেননা এখানে অন্তরের গভীরতায় কি আছে, তা দেখা হয়।

(৪) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ-

না কোন মুসলমান পুরুষ, না কোন মুসলমান মহিলার অধিকার রয়েছে যে যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কিছু নির্দেশ দেন, তখন তাদের নিজেদের দ্বিমত প্রকাশ করার। (আহযাব)

এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সামনে মুমিনের স্বীয় জানের ব্যাপারে ইখতিয়ার নেই। এ আয়াতটি যয়নব বিনতে হাজশের বিবাহের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। উনি হযরত যায়েদের সাথে বিবাহে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশে বিবাহ হয়েছিল। প্রত্যেক মুমিন পুরুষ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর গোলাম এবং প্রত্যেক মুমিন মহিলা তাঁর বাদী। এটাই ঈমানের হাকীকত।

(৫) اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মুমিনগণের বেলায় তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক এবং নবীর স্ত্রীগণ মুসলমানদের মা।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যখন আমাদের নিজেদের জানের থেকেও অধিক মালিক, তখন তিনি আমাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের মালিক হওয়াটা অধিকতর সঙ্গত।

(৬) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَلَاتَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ-

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বর থেকে উচু করো না, তাঁর বারগাহে এ রকম চেঁচামেচি করে কথা বলো না, যে রকম তোমরা একে অপরের সাথে বলো। এতে তোমাদের আমলসমূহ তোমাদের অজান্তে বরবাদ হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে।

সামান্য বেআদবী করার দ্বারা নেকীসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং নেকীসমূহের ক্ষতি কুফর ও ধর্মদ্রোহীতার দ্বারা হয়ে থাকে। এতে বুঝা গেল যে তাঁর সাথে সামান্য বেআদবীও কুফরী।

(৭) قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ- لَاتَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত সমূহ এবং তাঁর রসূলকে নিয়ে উপহাস করতেছ? বাহানা কর না, তোমরা মুসলমান হওয়ার পর কাফির হয়ে গেছ।

এ আয়াতে ঐ সব মুনাফিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, যারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অদৃশ্য জ্ঞানের ব্যাপারে উপহাস করে বলেছিল, কি জানি 'কবে নাগাদ তিনি রোমকে হার মানায়'। এ বেআদবীকে আল্লাহর আয়াতের সাথে বেআদবী হিসেবে ধরে নিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ওদের উপর কুফরীর ফত্ওয়া আরোপ করেছেন।

(৮) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

হে ঈমানদার গণ! আমার পয়গাম্বরকে راعنا বলিও না, انظرنا বল। ভাল করে শুনে নাও, কাফিরদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, যে কেউ হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বারগাহে যদি এ রকম শব্দ ব্যবহার করে, যেটাতে বেআদবীর অবকাশ থাকে, তাহলে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে। (যেমন رَاعِنَا শব্দটি)

সারকথা হলো, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে কুরআনের প্রত্যেক জায়গায় يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে ঈমানদারগণ!) বলে সম্বোধন করেছেন, কোন জায়াগায় হে তওহীদপন্থী, হে নামাযী, হে মওলভী, হে ফাজেলে দেওবন্দী বলে সম্বোধন করেন নি। এতে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ তাআলার সমস্ত নিয়ামত ঈমানের বদৌলতে পাওয়া যায় এবং ঈমানের হাকীকত হচ্ছে, সরকারে মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর গোলামী, যা উপরোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। তওহীদ হচ্ছে কাগজের নোট এবং নবুয়াত হচ্ছে সেই নোটের সীল। নোটের মূল্য সরকারী সীলের দ্বারা হয়ে থাকে। সীলবিহীন নোটের কোন মূল্য নেই। অনুরূপ ঈমানের নোট কিয়ামতের বাজারে তখনই মূল্যবান হবে, যখন সেটার উপর হুযূরের সীল থাকবে। ওনাকে বাদ দিয়ে তাওহীদের কোন মূল্য নেই। এ জন্য কলেমাতে হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নাম রয়েছে এবং কবরেও তাওহীদের স্বীকারোক্তির পর হুযূরকে সনাক্ত করতে হয়। হাদীছ ও কুরআনের কোন জায়গায় মুসলমানদেরকে তওহীদপন্থী বলা হয়নি বরং মুমিন বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

اسلام- ইসলাম

اسلام (ইসলাম) سلم (সলম) শব্দ থেকে গঠন করা হয়েছে, যার অর্থ সন্ধি, যুদ্ধের বিপরীত। আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান- وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا যদি তারা সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তাহলে আপনিও সেদিকে ধাবিত হোন। শাব্দিক অর্থে সন্ধি হলেও কিন্তু প্রচলিত অর্থে ইসলাম মানে বশ্যতা, আনুগত্য। কুরআন শরীফে এ 'ইসলাম' শব্দটি কোন সময় 'ঈমান' অর্থে, কোন সময় 'বন্দেগী' ও 'আনুগত্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নের আয়াত সমূহে ইসলাম শব্দটি 'ঈমান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(১) اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

আল্লাহর কাছে পছন্দীয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।

(২) هُوَسَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ

সেই আল্লাহ তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন।

(৩) مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَانَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا

ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম না ইহুদী ছিল, না ঈসায়ী। তবে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ঈমানদার।

(৪) قُلْ لَاتَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰنكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

বলে দিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তোমরা আমার কাছে তোমাদের ইসলাম গ্রহণের খোঁটা দিও না। বরং আল্লাহ তোমাদের উপর ইহসান করেছেন যে তিনি তোমাদেরকে ঈমানের হেদায়েত দান করেছেন।

(৫) تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ

আমাকে মুমিন হিসেবে মৃত্যু দান কর এবং নেক বান্দাদের সাথে মিলিত কর।

(৬) وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقَاسِطُوْنَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا

আমাদের মধ্যে কিছু মুসলমান এবং কিছু যালিম আছে। যারা ইসলাম গ্রহণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছে, তারা মঙ্গল খুঁজে নিয়েছে।

এ আয়াত সমূহে এবং এ রকম অন্যান্য আয়াতে ইসলাম শব্দটি ঈমান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং উম্মতের জন্য হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সত্যিকার গোলামীর উপর যে রকম ঈমান নির্ভরশীল, সে রকম ইসলামও হুযূরের গোলামীর উপর নির্ভরশীল। অতএব হুযূরের শানমান অস্বীকারকারী না মুমিন, না মুসলমান। যেমন শয়তান না মুমিন, না মুসলমান বরং কাফির ও মুশরিক।

কতেক আয়াতে ইসলাম শব্দটি আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

(১) وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ

সমস্ত আসমান ও জমীনের অধিবাসী সেই আল্লাহর অনুগত, প্রত্যেক কিছু তাঁরই আজ্ঞাবহ (সৃষ্টিগত ভাবে)।

এ আয়াতে قٰنِتِيْنَ শব্দটি اَسْلَمَ শব্দের ব্যাখ্যা করে দিল। কেননা সমস্ত কিছু সৃষ্টিগত ভাবে আল্লাহ তাআলার আজ্ঞাবহ কিন্তু সব মুমিন নয়, কতেক কাফিরও আছে مِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَّمِنْكُمْ كَافِرٌ (তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন এবং কেউ কাফির)।

(২) وَلَا تَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَقُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ

হে মুনাফিকরা! এটা বল না যে তোমরা ঈমান এনেছ বরং এ রকম বল যে আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি। এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। মুনাফিক আনুগত্যের অর্থে মুসলমান ছিল কিন্তু মুমিন ছিল না।

(৩) فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ– وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ

যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল উভয়ে আমার আদেশে মাথা পেতে দিল এবং পিতা পুত্রকে জবেহ করার উদ্দেশ্যে শোয়ায়ে দিল, তখন আমি ডাক দিলাম, হে ইব্রাহিম।

(৪) اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

যখন ইব্রাহীমকে তার সৃষ্টিকর্তা বললেন, অনুগত হয়ে যাও, তখন আরয করলেন, আমি রব্বুল আলামীনের অনুগত হলাম।

এ শেষের আয়াতদ্বয়ে ইসলামের অর্থ ঈমান নয়। কেননা নবীগণ জন্মগত ভাবে মুমিন হয়ে থাকেন। তাই ওনাদের ঈমান আনয়নের কোন অর্থ হতে পারে না।

উপরোক্ত এ চার আয়াতে ইসলাম আনুগত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম আয়াতে প্রকৃতিগত বিষয়াদির আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। যেমন- রোগ, সুস্থতা, জীবন মৃত্যু ইত্যাদি। শেষের দু আয়াতে শরয়ী আহকামের আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। সুতরাং মুনাফিকরা মুমিন ছিল না বরং নামে মাত্র মুসলিম ছিল অর্থাৎ বাধ্য হয়ে ইসলামী বিধি বিধানের অনুসারী হয়েছিল।

تقوى - তাকওয়া

কুরআনে করীমে تقوى (তাকওয়া) শব্দটি অনেকবার উল্লেখিত হয়েছে বরং ঈমানের সাথে তাকওয়ার নির্দেশ প্রায় জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। তাকওয়া অর্থ ভয় করা বা বাঁচা। যদি এর সম্পর্ক আল্লাহ তাআলা বা কিয়ামতের দিনের সাথে হয়, তখন তাকওয়া দ্বারা ভয় করা বুঝায়। কেননা আল্লাহ বা কিয়ামত থেকে কেউ বাঁচতে পারেনা। যেমন–

(১) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর।

(২) وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا

ঐ দিনকে ভয় কর, যে দিন কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির পক্ষে হয়ে কিছু করতে পারবে না।

যদি তাকওয়ার সাথে আগুন বা গুনাহের কথা বর্ণিত হয়, তখন ওখানে তাকওয়া অর্থ হবে- বাঁচা। যেমন–

(৩) فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

সেই আগুন থেকে বেঁচে থেকো, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর।

যদি তাকওয়া শব্দের পর আল্লাহ বা দোযখ কোন কিছুর কথা বর্ণিত না থাকে, তাহলে ওখানে ভয় করা ও বাঁচা উভয় অর্থ করা যাবে। যেমন–

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ–

সেই সব পরহিজগারদের জন্য হেদায়েত, যারা গায়েবের উপর ঈমান রাখে। অতএব সবর কর। নিশ্চয়ই প্রতিফল পরহিজগারদের জন্য।

কুরআনের পরিভাষায় তাক্ওয়া দু'প্রকার– শরীরের তাক্ওয়া ও মনের তাক্ওয়া।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শরীরের তাকওয়া আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের উপর নির্ভর। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

(১) فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔

যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য স্বীকার করেছে, ওদের কোন ভয় নেই এবং ওরা দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে না।

(২) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ

আল্লাহর ওলী সে, যে ঈমান এনেছেন এবং পরহিজগারী করতেন।

(৩) اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

যদি আল্লাহর আনুগত্য কর, তাহলে তোমাদের জন্য পার্থক্য বলে দিবেন।

মনের তাকওয়া আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ও তাঁদের সাথে সম্পর্কিত জিনিসের প্রতি সম্মান করার উপর নির্ভর করে। তাবারুকাতের প্রতি অসম্মানকারী আন্তরিক পরহিজগার হতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

(১) وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর নিশানা সমূহের সম্মান করে, এটা মনের পরহিজগারীর অন্তর্ভুক্ত।

(২) وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ

যে আল্লাহর পবিত্র জিনিস সমূহের তাজিম করে, ওর জন্য ওর রবের কাছে মঙ্গল রয়েছে।

এটাও কুরআন থেকে জেনে নিন যে আল্লাহর নিশানা সমূহ কি জিনিস। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান -

(৩) اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا–

সাফা ও মরওয়া পাহাড় আল্লাহর নিশানা সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্ব করে বা ওমরা করে, ঐ পাহাড় দ্বয় তাওয়াফ করা ওর জন্য গুনাহ নয়।

সাফা ও মরওয়া হচ্ছে সেই পাহাড়, যার উপর হযরত হাজেরা পানির সন্ধানে সাত বার উঠানামা করে ছিলেন। এ পাহাড়দ্বয় আল্লাহর প্রিয় বান্দার কদমের বরকতে আল্লাহর

নিশানা হয়ে গেছে, এবং হাজীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত সেই পবিত্র বিবির অনুকরনে সাত বার উঠানামা অপরিহার্য হয়ে গেছে। বুজুর্গানে কিয়ামের পরিত্র কদমের স্পর্শে যে কোন জিনিস আল্লাহর নিশানা হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

(৪) وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى

তোমরা মকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থানে পরিনত কর।

মকামে ইব্রাহীম হচ্ছে সেই পাথর যেটায় দাঁড়িয়ে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম কাবাঘর তৈরী করেছিলেন। সেটাও হযরত ইব্রাহীম খলীলের বরকতে আল্লাহর নিশান হয়ে গেছে এবং এর তাজীয এ রকম অপরিহার্য হয়ে গেছে যে, তাওয়াফের নফল নামায সেটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়াটা সুন্নাত সাব্যস্ত হয়েছে, যাতে সিজদায় মাথা ঐ পাথরের সামনে নত হয়।

যখন বুজুর্গানে কিয়ামের কদমের স্পর্শে সাফা মরওয়া এবং মকামে ইব্রাহীম আল্লাহর নিশান সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল এবং তাজীমের বিষয় হয়ে গেল, তখন আম্বীয়ায়ে কিরাম ও আউলীয়ায়ে এজামের মাযার সমূহ, যেখানে তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ীভাবে স্বশরীরে অবস্থান করছেন, নি:সন্দেহে আল্লাহর নিশান সমূহের অন্তর্ভূক্ত এবং এগুলোর তাজীম আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান-

(৫) فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ – قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا–

লোকেরা বললো, এ আসহাবে কাহাফের জন্য ইমারত তৈরী কর। ওনাদের প্রভু ওনাদেরকে ভালকরে জানেন। যে এ কাজে প্রভাবশালী সে বললো, আমরা তো এখানে নিশ্চয় মসজিদ নির্মান করবো।

আসহাবে কাহাফের আরাম গাহ গুহার পাশে অতীতের মুসলমানরা ওনাদের স্মরণে মসজিদ নির্মান করেছিল এবং আল্লাহ তাআলা এর জন্য অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। এতে বুঝা গেল, সে জায়গাটা আল্লাহর নিশান হয়ে গেছে, যার তাজীম আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

(৬) وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ

কুরবাণীর পশু (হাদী) আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিশানাসমূহের অন্তর্ভূক্ত করেছি। এতে তোমাদের জন্য কল্যান রয়েছে।

যে পশু কুরবাণীর জন্য বা পবিত্র কাবার জন্য নির্ধারিত করা হয়, যেটা আল্লাহর নিশানা হিসেবে গন্য; এর যথাযথ মর্যাদা দান করা উচিত। যেমন কুরআনের জুজদান,

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাবার গিলাফ, জমজমের পানি এবং মক্কা শরীফের জমীন ইত্যাদির তাজিম করা হয়। কেননা যে গুলোর সাথে আল্লাহ বা আল্লাহর প্রিয়জনদের সম্পর্ক রয়েছে, সে সবের তাজীম আবশ্যক।

(৭) وَلَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ

আমি সেই পবিত্র মক্কা শহরের শপথ করছি। অথচ হে মাহবুব, আপনি সেই শহরে অবস্থান করছেন।

(৮) وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ-
اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ-

আঙ্গুর, যায়তুন ও তুরেসীনা পাহাড় এবং এ নিরাপদ শহর মক্কা শরীফের শপথ, বায়তুল মোকাদ্দসের দরজায় সিজদা করে প্রবেশ কর এবং বল, ক্ষমা করুন। আমি ক্ষমা করে দেব।

তুর পাহাড় ও মক্কা মুয়াজ্জমা এ জন্য সম্মানিত হয়ে গেছে যে তুর পাহাড় মূসা কলিমুল্লাহর সাথে এবং মক্কা মুয়াজ্জমা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহের সাথে সম্পর্কিত।

সারকথা হলো, আল্লাহর প্রিয় পাত্রদের সম্পর্কিত জিনিস সমূহ আল্লাহর নিশানা হিসেবে গণ্য। যেমন কুরআন শরীফ, খানায়ে কাবা, সাফা-মরওয়া পাহাড়, মক্কা মুয়াজ্জমা, বায়তুল মোকাদ্দস, তুর পাহাড়, নবী ও ওলীগণের মাযার সমূহ, জমজম কূপের পানি ইত্যাদি আল্লাহর নিশান। আল্লাহর নিশানার তাজীম কুরআনী ফত্ওয়া দ্বারা আন্তরিক তাকওয়া হিসেবে গণ্য। যে নামাযী ও রোযাদারের অন্তরে তাবারুকাতের প্রতি সম্মানবোধ নেই, সে আন্তরিক পরহিজগার নয়।

উপরোক্ত কুরআনের আয়াতসমূহের দ্বারা বুঝা গেল যে কুরআনের যেখানেই তাকওয়ার কথা বর্ণিত আছে, সেটার দ্বারা আন্তরিক তাকওয়া অর্থাৎ পবিত্র জিনিসের তাজীম বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে করীমা তাক্ওয়া সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত আয়াতের তফসীর। যেখানে তাক্ওয়ার কথা বর্ণিত আছে, সেখানে এ শর্তারোপ করা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান ঃ-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ

নিশ্চয় যারা নিজেদের কণ্ঠস্বর রসূলুল্লাহের সামনে ছোট করে, তারা হচ্ছে- যাদের অন্তর আল্লাহ তাআলা পরহিজগারীর জন্য বাচাই করেছেন। ওদের জন্য ক্ষমা ও বড় ছওয়াব রয়েছে।

মাহফিলে মীলাদে হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি সম্মানবোধ হচ্ছে তাক্ওয়া। কেননা এটাও আল্লাহর নিদর্শন এবং আল্লাহর নিদর্শন সমূহের ইজ্জত হচ্ছে আন্তরিক তাক্ওয়া। ঈমান হচ্ছে মূল আর তাক্ওয়া হচ্ছে এর ডাল-পালা। ফলের আশা সেই করতে পারে, যে উভয়ের হেফাজত করে। অনুরূপ ক্ষমাপ্রাপ্তির ফল তারই নসীব হবে, যে ঈমান ও তাক্ওয়া উভয়ের অধিকারী।

কুফর- كفر

কুফরের অর্থ ঢেকে ফেলা ও মিটায়ে ফেলা। এ জন্য অপরাধের শরয়ী সাজাকে কাফ্ফারা বলা হয়। কেননা এটা গুনাহকে মিটায়ে ফেলে। একটি ঔষুধের নাম কাফুর, যেটা স্বীয় উগ্র সুঘ্রান দ্বারা অন্যান্য ঘ্রানকে ঢেকে ফেলে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا-

যদি তোমরা বড় গুনাহ সমূহ থেকে বিরত থাক, তাহলে আমি তোমাদের ছোট গুনাহ সমূহ মিটায়ে ফেলবো এবং তোমাদেরকে উত্তম জায়গায় প্রবেশ করাবো।

কুরআন শরীফে এ كفر শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- নাশোকরী, অস্বীকার, ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

(১) لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ

যদি শোকর কর, তাহলে তোমাদেরকে আরও অধিক দেব আর যদি নাশোকরী কর, তাহলে আমার কঠিন শাস্তি রয়েছে।

(২) وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

আমার শোকর কর, নাশোকরী কর না।

(৩) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

ফেরাউন মূসা আলাইহিস সালামকে বললো, তুমি নিজের কাজটা করেছ, যেটা করেছ। তুমি অকৃতজ্ঞ।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে কুফর নাশোকরী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

(১) فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

যে ব্যক্তি শয়তানকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে মজবুত হাতল ধরলো।

(২) يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

ঐ দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লানত দিবে।

(৩) وَكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ

এ সব বাতিল উপাসকরা ওদের উপাসনার অস্বীকারকারী হয়ে যাবে।

এ সব আয়াতে কুফর অস্বীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

(১) قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ

বলে দিন, হে কাফিরেরা আমি তোমাদের উপাসকদের পূজা করি না।

(২) فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ

অতএব সেই কাফির (নমরুদ) আশ্চর্য হয়ে গেল।

(৩) وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

কাফিরেরা হলো জালিম।

(৪) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ

ওরা কাফির হয়ে গেছে, যারা বলেছে- ঈসা ইবনে মরয়ম হচ্ছে আল্লাহ।

(৫) لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

বাহানা করনা, তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ।

(৬) فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ

ওদের মধ্যে কতেক ঈমান এনেছে এবং কতেক কাফির রয়ে গেছে।

এ রকম আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যেখানে কুফর শব্দটি ঈমানের মুকাবিলায় ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ বেঈমান হয়ে যাওয়া, ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া।

ঈমানের মুকাবিলায় এ কুফর সব বিষয়ে প্রয়োগ হবে অর্থাৎ যেসব বিষয় গুলো মান্য করা ঈমান, ও গুলো থেকে যে কোন একটাকে অস্বীকার করাটাও কুফর। অতএব কুফরী নানা ভাবে হতে পারে। আল্লাহকে অস্বীকার করা, আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার তথা শিরক করাও কুফরী। অনুরূপ ফিরিশতা, জান্নাত-দোযখ, হাশর-নশর, নামায-রোযা, কুরআনের আয়াত, মোট কথা দীনের প্রয়োজনীয় কোন একটি বিষয় অস্বীকার করা কুফর। এ জন্য কুরআন শরীফে নানা প্রকারের কাফিরদের কথা উল্লেখিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ 'শিরক' অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

কুফরের হাকীকত ঃ- যদিওবা অনেক কিছুকে মানার নাম ঈমান, কিন্তু ওসব কিছুর মূলে রয়েছে নবীকে মান্য করা। যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে পরিপূর্ণভাবে মান্য করলো, সে সব কিছু মেনে নিল। অনুরূপ কুফরও মূলতঃ একটি বিষয়ের উপর নির্ভর। সেটা হচ্ছে হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর আজমত ও শানমানকে অস্বীকার করা। এটাই হচ্ছে কুফরীর মুল, অন্য সব এর শাখা-প্রশাখা। যেমন আল্লাহর সত্ত্বা বা গুনাবলীকে অস্বীকারকারী মূলতঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অস্বীকারকারী। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন আল্লাহ এক আর এ বলছে আল্লাহ দুই। এ রকম নামায-রোযা ইত্যাদি কোন একটির অস্বীকার মূলতঃ হুযূরকে অস্বীকার বুঝায়। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, এ সব বিষয় ফরয আর সে বলে ফরয নয়। এ জন্য নবী করীম (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি সামান্য বেআদবী বা তাঁর কোন কিছুর প্রতি সামান্য অবজ্ঞা, কুরআনের ফতওয়া অনুসারে কুফরী। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমানঃ

(১) وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا - اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا- وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا-

ওসব কাফিরেরা বলে আমরা কতেক পয়গম্বরের উপর ঈমান আনবো এবং কতেককে অস্বীকার করবো। তারা চায় যে ঈমান ও কুফরের মাঝখানে কোন পথ বের করতে। এ সব লোক নিঃসন্দেহে কাফির। কাফিরদের জন্যই রয়েছে কঠিন আযাব।

(২) وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্যই রয়েছে কঠিন শাস্তি।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে কাফিরদের জন্যই বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। এতে বুঝা গেল, সেই প্রকৃত কাফির, যে রসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে কষ্ট দেয় আর যে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাঁর খেদমত ও আনুগত্য করে, সে প্রকৃত মুমিন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমানঃ-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ-

যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে আশ্রয় দিয়েছে ও তাঁকে সাহায্য করেছে, তারা সত্যিকার মুসলমান। তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রোযী রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ ফরমান ঃ-

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ-

তারা কি জানে না, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীতা করে, ওর জন্য জাহান্নামের আগুন অবধারিত, সদা সেখানে থাকবে। এটা বড় জিল্লতী।

উল্লেখ্য যে, যে ভাল কাজে হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্য প্রকাশ পায় না বরং বিরোধীতা প্রকাশ পায়, সেটা কুফরী হিসাবে গণ্য। আবার যে খারাপ কাজে হুযূরের আনুগত্য প্রকাশ পায়, সেটা ঈমান হিসেবে গণ্য। যেমন মসজিদ তৈরী করা ভাল কাজ। কিন্তু মুনাফিকরা যখন হুযূরের বিরোধীতা করার নিয়তে মসজিদে জেরার তৈরী করলো, তখন কুরআন সেটাকে কুফরী সাব্যস্ত করলো। কালামে পাকে বর্ণিত আছে-

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ

যারা মসজিদ তৈরী করেছিল ক্ষতি সাধন ও কুফরীর জন্য এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করার সুযোগের জন্য, তারা আগে থেকেই আল্লাহ ও রসূলের বিরোধী।

নামায ভঙ্গ করা গুনাহ কিন্তু হুযূরের ডাকে নামায ভঙ্গ করা গুনাহ নয় বরং ইবাদত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হিসেবে গণ্য।

আল্লাহ তাআলা ফরমান-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ-

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে আহবান করে। কেননা সেটা তোমাদেরকে জিন্দেগী দান করে।

এ জন্য হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আওয়াজ থেকে উঁচু আওয়াজ করা এবং হুযূরের প্রতি সামান্য বেআদবী করাকে কুরআন কুফরী ঘোষনা করেছে। এ প্রসঙ্গের আয়াতটি ঈমান অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। শয়তান যথেষ্ট ইবাদত করেছিল কিন্তু যখন আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে বললো-

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ - قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ-

আমি ওনার থেকে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা আর ওনাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, তুমি মরদুদ হয়ে গেছ।

এতে সঙ্গে সঙ্গেই শয়তান কাফির হয়ে গেল।

ফিরাউনের যাদুকরেরা মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মান পূর্বক যাদু করার আগে আরয করেছিল-

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ-

হে মূসা! প্রথমে কি আপনি ফেলবেন, নাকি আমরা ফেলবো?

এ অনুমতি প্রার্থনা করে সম্মান দেখানোর ফল এটাই হলো যে এক দিনেই তাদের ঈমান, কলিমুল্লাহ আলাইহিস সালামের সহচার্য, তাকওয়া, সবর ও শাহাদত নসীব হলো। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا (যাদুকরদেরকে সিজদায় পতিত করা হলো।)

অর্থাৎ ওরা নিজেরা সিজদায় পতিত হয়নি। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পতিত করা হয়েছে। কাফিরদের অন্তরে হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সম্মানবোধ সৃষ্টি হলে, ইনশা আল্লাহ মুমিন হয়ে যাবে। আর যদি মুমিন বেআদবী রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে ঈমান হারা হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা অপরাধী ছিলেন কিন্তু বেআদব ছিলেন না। তাই তাঁদেরকে ক্ষমা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করা হয়েছে। কিন্তু হযরত আদম আলাইহিস সালামের ছেলে কাবিল শুধু অপরাধ নয়, নবীর সাথে বেআদবীও করে ছিল। তাই পরিনতি ভাল হয় নি।

شرك – শিরক

شـرك (শিরক) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অংশ। তাই অংশিদারকে শরিক বলা হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

(১) اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

ওসব মূর্তিদের কি আসমান-জমীনে অংশ আছে?

(২) هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيْمَا رَزَقْنَاكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ–

আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, সেখানে তোমাদের অধীনস্থ গোলামদের মধ্যে কেউ কি অংশিদার, যাতে তোমরা বরাবর হয়ে যাও। ওসব গোলামদেরকে তোমরা এ রকম ভয় কর, যেমন নিজের জীবনের ব্যাপারে ভয় কর।

(৩) رَجُلًا فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ

একজন ঐ রকম গোলাম যার কয়েকজন সমান অংশিদার (মালিক) আছে আর একজন ঐ রকম গোলাম, যে কেবল এক ব্যক্তির অধীন। এ দু'জন কি সমান?

উপরোক্ত আয়াতসমূহে شـرك ও شـريك শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ অংশ ও অংশিদার বুঝানো হয়েছে। অতএব শিরকের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কাউকে খোদার সমান মনে করা। কুরআন শরীফে শিরক শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নের আয়াত সমূহে شـرك কুফর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(১) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ–

আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না।এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে দিবেন।

(২) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا–

মুশরিকদেরকে বিবাহ কর না, যে পর্যন্ত ঈমান না আনে।

(৩) وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ–

মুমিন গোলাম মুশরিক থেকে উত্তম।

(৪) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ–

মুশরিকদের এ অধিকার নেই যে, নিজেদের কুফরীর দাবী করে আল্লাহর মসজিদ সমূহ আবাদ করা।

এ আয়াত সমূহে শিরক দ্বারা প্রত্যেক কুফর বুঝানো হয়েছে। কেননা কোন কুফরই ক্ষমার যোগ্য নয় এবং কোন কাফিরের সাথে মুমিন নারীর বিবাহ জায়েয নেই। প্রত্যেক মুমিন যে কোন কাফির থেকে উত্তম, চাই সে মুশরিক হোক যেমন হিন্দু বা অন্য কেউ যেমন ইহুদী,পারসিক, মজুসী ইত্যাদি।

অপর অর্থে শিরক মানে কাউকে আল্লাহর সমতূল্য মনে করা.যেটা কুফর থেকেও জঘন্য। প্রত্যেক শিরক কুফর কিন্ত প্রত্যেক কুফর শিরক নয়। যেমন প্রত্যেক কাক কালো কিন্ত প্রত্যেক কালো বস্তু কাক নয়, প্রত্যেক স্বর্ণ চকচকে কিন্ত প্রত্যেক চকচকে জিনিস স্বর্ন নয়। নাস্তিক ব্যক্তি কাফির কিন্তু মুশরিক নয় কিন্তু হিন্দু কাফিরও এবং মুশরিকও। কুরআন শরীফে শিরক শব্দটি প্রায় এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

(১) جَعَلَا لَهٗ شُرَكَاءَ فِيْمَا اٰتٰهُمَا

তারা দু'জন ঐ নেয়ামতে আল্লাহর সমান করে দিয়েছে,যেটা আল্লাহ তাআলা ওদের কে দিয়েছে।

(২) حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

আমি সমস্ত মন্দ ধর্ম থেকে অসন্তুষ্ট এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(৩) اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

নিশ্চয় শিরক বড় জুলুম।

(৪) وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ

ওদের মধ্যে অনেকে আল্লাহর উপর ঈমান আনেনি,ওরা মুশরিক।

এ রকম অনেক আয়াতে শিরক শব্দটি আল্লাহর বরাবর মনে করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শিরকের হাকীকতঃ কাউকে আল্লাহ তাআলার সমপর্য্যায়ের জ্ঞান করাই শিরকের মূল। অর্থাৎ যতক্ষন কাউকে আল্লাহর সমান মনে করা না হয়,ততক্ষন শিরক হবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

না।এজন্যই কিয়ামতের দিন কাফিরেরা তাদের মূর্তিদেরকে বলবে

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

খোদার কসম.আমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে ছিলাম। কারন তোদেরকে রব্বুল আলামীনের বরাবর মনে করতাম। এ বরাবর জানার কয়েকটি ধরন আছে ঃ

এক ঃ কাউকে খোদার স্বজাত মনে করা।যেমন খৃষ্টানেরা ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে এবং ইহুদীরা উজাইর(আলাইহিস সালাম) কে খোদার পুত্র মনে করতো, আরবের মুশরিকেরা ফিরিশতাগনকে খোদার কন্যা মনে করতো। যেহেতু সন্তান পিতার স্বজাত ও সমপয্যায়ের হয়ে থাকে, সেহেতু এ রকম ধারনা পোষণকারীরা মুশরিক। আল্লাহ তাআলাইরশাদ ফরমান ঃ

(১) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ

এ সব লোকেরা বলে যে আল্লাহ সন্তান গ্রহন করেছেন। আল্লাহ এর থেকে পবিত্র বরং এরা হচেছ আল্লাহর সম্মানিত বান্দা।

(২) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ

ইহুদীরা বলে উজাইব (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর বেটা এবং খৃষ্টানেরা বলে মসিহ আল্লাহর বেটা।

(৩) وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ

ওসব লোকেরা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। নিশ্চয় মানুষ একেবারে অকৃতজ্ঞ।

(৪) وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ

ওরা আল্লাহর বান্দা ফিরিশতাগণকে মহিলা সাব্যস্ত করেছে। তারা কি ওদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল?

(৫) اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَّاَصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ

তিনি কি তাঁর সৃষ্টি কূলের মধ্যে মেয়েদেরকে গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে ছেলেদের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন?

(৬) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنَاتٍ

بِغَيْرِ عِلْمٍ

তারা জ্বিনদেরকে আল্লাহর অংশিদার সাব্যস্ত করেছে অথচ ওদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর জন্য না জেনেই পুত্র কন্যা সাব্যস্ত করেছে।

(৭) لِيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى

এসব কাফিরেরা ফিরিশতাগণের নাম মহিলাদের নামের মত রাখতো।

এ রকম অনেক আয়াতে এ ধরণের শিরক বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ কাউকে আল্লাহর সন্তান মনে করা।

দুই, কাউকে আল্লাহর মত সৃষ্টিকর্তা মনে করা। যেমন আরবের কতেক কাফিরের বিশ্বাস ছিল যে ভাল কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং মন্দ কোন কিছুর সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে অন্য প্রভু । এখনও পারসিকরা এ রকম বিশ্বাস করে– মঙ্গলের সৃষ্টিকর্তাকে ইয়াযদান এবং অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তাকে আহরমান বলে। এটা সেই পুরানো শিরকী বিশ্বাস। আবার কতেক কাফির বিশ্বাস করতো যে, তারা নিজেরাই নিজেদের মন্দকাজের সৃষ্টিকর্তা। ওদের মতে খারাপ জিনিস সৃষ্টি করা খারাপ। তাই এর সৃষ্টিকর্তা অন্য কেউ। এ ধরণের মুশরিকদের অভিমত খন্ডনে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। স্মতব্য যে খৃষ্টানেরা তিন খোদার বিশ্বাসী ছিল, যার মধ্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অন্যতম। এ সবের খন্ডনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

(১) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ

আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ও তোমাদের সমস্ত কাজকর্মকে সৃষ্টি করেছেন।

(২) اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ

আল্লাহ তাআলা সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সব কিছুর ক্ষমতাবান।

(৩) خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

আল্লাহ তাআলা হায়াত-মউত সৃষ্টি করেছেন। তিনি আসমান ও যমীনসমূহ এবং এ গুলোর মধ্যকার জিনিসসমূহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(৪) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ

নিশ্চয়ই ওরা কাফির হয়ে গেছে, যারা বলে যে মরয়মের পুত্র মসিহ হলেন আল্লাহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ

নিশ্চয়ই ওরা কাফির হয়ে গেছে, যারা বলে আল্লাহ তিন খোদার মধ্যে তৃতীয়।

(৬)لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

যদি যমীন-আসমানের মধ্যে এক খোদা ছাড়া অন্য মাবুদ থাকতো, তাহলে উভয়ে গণ্ডগোল করতো।

(৭)هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

এটা আল্লাহর মখলুক (সৃষ্টি)। অতএব এ ছাড়া তোমরা কি সৃষ্টি করেছ, তা আমাকে দেখাও।

এ রকম সমস্ত আয়াতে দ্বিতীয় প্রকারের শিরকের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এর খন্ডন করা হয়েছে। যদি এসব মুশরিকরা গায়রুল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস না করতো, তাহলে ওসব মাবুদদের সৃষ্টিকর্ম দেখানোর কথা বলাটা সঠিক হতো না।

তিন, যুগকে সৃষ্টিকর্তা মনে করা এবং আল্লাহর অস্থিত্বকে অস্বীকার করা। আরবের কতেক মুশরিকদের এ বিশ্বাস ছিল। বর্তমান যুগে প্রকৃতবাদীরাই হচ্ছে ওদের উত্তরসূরী। আল্লাহ তাআরা ইরশাদ ফরমান–

وَقَالُوْا مَاهِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ– وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ–

তারা বলে, ওটা কিছুই না, আমাদের দুনিয়াবী জিন্দেগী মাত্র। আমরা জীবিত থাকি ও মৃত্যুবরন করি। যুগ ছাড়া অন্য কেউ আমাদেরকে ধ্বংস করে না। ওদের এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই।

এ ধরণের প্রকৃতিবাদীর অভিমত খন্ডনের জন্য সে সব আয়াত উল্লেখযোগ্য, যে সব আয়াতে বলা হয়েছে– দুনিয়ার আশ্চর্যকর জিনিস গুলোর প্রতি মনোযোগ সহকারে দেখুন। এ সব মহা বিজ্ঞান সম্মত জিনিস গুলো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না।

(১) يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ اِنَّ ذَالِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

রাত দিনকে ঢেকে ফেলে। এতে চিন্তাশীলদের জন্য গবেষনার অনেক নিদর্শন রয়েছে।

(২) اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ

নিশ্চয় আসমান-যমীনের সৃষ্টি এবং দিন-রাত বড় ছোট হওয়ার মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

(৩) وَفِى الْاَرْضِ اٰيَاتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَاتُبْصِرُوْنَ

আস্থাশীলদের জন্য পৃথিবীর মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। স্বয়ং তোমাদের ব্যক্তিসত্ত্বার মধ্যেই নিদর্শন রয়েছে। তোমরা এসব দেখনা কেন?

(৪) اَفَلَايَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

তারা কি উটের দিকে দেখে না, কি ভাবে একে সৃষ্টি করা হয়েছে। আসমানের দিকে দেখে না, কি রকম উঁচু করা হয়েছে। পাহাড়ের দিকে দেখে না, কেমন ভাবে স্থাপিত করা হয়েছে, এবং যমীনের দিকে দেখে না, কি ভাবে বিছানো হয়েছে।

এ ধরণের বিশটি আয়াতে ওধরণের প্রকৃতিপূজারীদের অভিমত খন্ডন করা হয়েছে।

চার, আল্লাহকে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা মনে করা। তবে সাথে সাথে এ ধারনাও পোষন করা যে তিনি একবার সৃষ্টি করার পর দুর্বল হয়ে গেছে। এখন কোন কাজে সক্ষম নয়, অন্যান্য মাবুদরা এখন তাঁর খোদায়ী কর্ম পরিচালনা করছে। এ ধরণের মুশরিকরা নানা অদ্ভুত কথা বলতো। তারা বিশ্বাস করতো যে আল্লাহ ছয় দিনে আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিন দুর্বলতা দূর করার জন্য বিশ্রাম নিয়েছেন। এখনও সেই বিশ্রামে আছেন। ফেরকায়ে তাতিলিয়া এ ধরণের মুশরিকদের স্মৃতিবাহক। নিম্নের আয়াত সমূহে ওদের ভ্রান্ত ধারণা খন্ডন করা হয়েছে ঃ

(১) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ–

আমি আসমান-যমীন ও এ দু'এর মাঝখানে যা কিছু আছে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, এবং আমাকে দুর্বলতা স্পর্শ করেনি।

(২) اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِىْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ –

তাহলে কি আমি প্রথমবার সৃষ্টি করে দুর্বল হয়ে গেছি। বস্তুতঃ তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দিহান।

(৩) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারা কি লক্ষ্য করেনি যে আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এ গুলো সৃষ্টি করে দুর্বল হন নি। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করতেও সক্ষম।

(৪) اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

আল্লাহর শান হচ্ছে, যখন তিনি কোন কিছু করার মনস্থ করেন তখন 'হয়ে যাও' বলেন। এতে সেটা হয়ে যায়।

এ ধরণের মুশরিকদের বিশ্বাস খন্ডনে এ রকম আরও অনেক আয়াত আছে। এ সব আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহর কাছে দুনিয়া সৃষ্টি করার ব্যাপারে কোন প্রকারের ক্লান্তি বোধ হয়নি। এ ধরনের মুশরিক কিয়ামতের অস্বীকারকারী হওয়ার এটা একটি অন্যতম কারণ যে ওরা মনে করতো যে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া একবার সৃষ্টি করে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গেছে। তাই পুনরায় কি করে সৃষ্টি করবে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে আমি কেবল 'হয়ে যাও' বলার সাথে সাথে প্রত্যেক কিছু হয়ে যায়। তাই ক্লান্ত কিসের? আমি পুনরায় সৃষ্টি করার ব্যাপারে অধিক ক্ষমতাবান। আবিস্কারের চেয়ে পুনঃনির্মান অধিক সহজ।

পাঁচ, পঞ্চম প্রকারের মুশরিকদের বিশ্বাস হলো প্রত্যেক অনু-পরমানুর মালিক ও সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা। কিন্তু তিনি এত বড় সাম্রাজ্য একাকি সামাল দিতে অক্ষম। তাই তিনি বাধ্য হয়ে তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে কতেককে তাঁর সাম্রাজ্য পরিচালনা করার জন্য মনোনিত করেছেন। যেমন দুনিয়াবী বাদশাহ তাঁর রাজ্য পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন প্রশাসক নিয়োগ করে থাকেন। যে সব বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত করেছেন, তাঁরা বান্দা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর উপর বিশেষ প্রভাব রাখেন। তাঁরা আমাদের ব্যাপারে কোন সুপারিশ করলে, আল্লাহ মানতে বাধ্য হন। তাই তাঁরা আমাদের যে কোন সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন। আল্লাহ তাদের কথা রাখেন, নচেৎ গনেশ উল্টে যাবে। যেমন সংসদের সদস্যরা যদিওবা রাষ্ট্র প্রধানের অনুগত কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সবের দখল থাকে। আরবের অনেকেই এ ধরণের শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের মূর্তি- দু, ইয়াগুছ, লাত মানাত, উজ্জা ও অন্যান্য মূর্তিগুলোকে আল্লাহর সহায়তাকারী বান্দা বলে বিশ্বাস করে আল্লাহকে সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা মনে করেও মুশরিক ছিল। এ বিশ্বাসে কাউকে ডাকা, শাফায়াতকারী মনে করা, হাজত পূর্ণকারী ও মুশকিল আসানকারী মনে করা, ওর সামনে মাথানত করা, সম্মান করা, সবই শিরক। মোট কথা আল্লাহর সাথে সম পর্যায়ের ধারনা করে যা কিছু করা হবে, সবই শিরক হিসেবে গণ্য হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কালামে পাকে ইরশাদ ফরমান ঃ

وما يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ-

ওসব মুশরিকদের মধ্যে অনেকেই এ রকম আছে যে তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। কিন্তু শিরক করে।

অর্থাৎ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও রিজিকদাতা মান্য করার পরও মুশরিক।

এ পঞ্চম ধরণের মুশরিকদের সম্পর্কে নিম্নের আয়াত সমূহ বর্ণিত হয়েছে ঃ

(১) ولئن سالتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانى يؤفكون -

যদি আপনি ওসব মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে আসমান-যমীন কে সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্য কে অনুগত করেছেন? তারা বলবে- আল্লাহ। তখন আপনি বলুন, তাহলে কেন ভুলে যাচ্ছ?

(২) قل من بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون- سيقولون لله قل فانى تسحرون

জিজ্ঞেস করুন, প্রত্যেক কিছুর বাদশাহী কার হাতে? যিনি পানাহ দেন এবং যাকে পানাহ দেয়া হয় না। যদি তোমরা তা জেনে থাক, তহলে বলবে আল্লাহর হাতে। জিজ্ঞেস করুন, তবুও তোমরা যাদুর প্রতি মুহিত কেন?

(৩) ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم

যদি আপনি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে আসমান-যমীন কে সৃষ্টি করেছেন, তখন ওরা বলবে ওগুলোকে অধিক জ্ঞানী আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন।

(৪) قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون- سيقولون لله قل افلا تذكرون-

আপনি বলুন, তোমরা যদি জান, তাহলে বল দেখি যমীন ও এর মধ্যে যা কিছু আছে এ গুলো কার? তারা বলবে আল্লাহরই। তখন আপনি বলুন, তাহলে তোমরা নসীহত কেন গ্রহণ করছ না?

(৫) قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم- سيقولون لله قل افلا تتقون-

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলুন, সাত আসমান ও মহা আরশের প্রভূ কে? তারা বলবে সবই আল্লাহর। আপনি বলুন, তাহলে তোমরা আল্লাহকে ভয় করনা কেন?

(৬) قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ-

জিজ্ঞাসা করুন, আসমান-যমীম থেকে তোমাদেরকে রিযিক কে দেয়? বা চোখ-কানের সৃষ্টিকর্তা কে? এবং কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করে এবং কাজ সমূহের প্রতিভা কে সৃষ্টি করে? তারা বলবে-আল্লাহ। তখন আপনি বলুন, তাহলে তোমরা ভয় করছনা কেন?

(৭) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ-

যদি আপনি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে আসমান থেকে কে পানি বর্ষন করেছে। অতঃপর মৃত যমীনকে জীবিত করেছে? তখন তারা বলবে- আল্লাহ করেছেন।

এ রকম অনেক আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে এ ধরণের মুশরিকরা আল্লাহকে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, জীবিতকারী, মৃত্যু দানকারী, আশ্রয় দানকারী, বিশ্বপরিচালনাকারী হিসেবে বিশ্বাস করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন মুশরিক ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর কুরআন মজিদে রয়েছে। আল্লাহ তাআরা বলেন যে ওদের এ সব বিশ্বাসের পরও দুটি কারণে মুশরিক ছিল- একেতঃ ওরা খোদাকে বিশ্বের একক মালিক মনে করতো না বরং আল্লাহর সাথেও অন্যদেরকে মাবুদ মনে করতো। উপরোক্ত আয়াত সমূহে لِلّٰه শব্দের ل বর্ণটি দ্বারা মালিকত্ব বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ ওরা আল্লাহকে মালিক মনে করতো কিন্তু একক মালিক মনে করতো না বরং তারা অন্য মাবুদদেরও বিশ্বাসী ছিল। এ জন্য ওরা এ রকম বলতো না যে মালিকত্ব ও হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর, অন্য কারো নেই। বরং তারা বলতো যে আল্লাহ এবং অন্যদেরও মালিকত্ব ও হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তারা মনে করতো যে আল্লাহ এ সব কাজ একাকী করতো না বরং ওদের মূর্তিদের সহযোগিতা নিয়ে করতো। আল্লাহ ওদের সাহায্য নিতে বাধ্য ছিল। নিম্নের আয়াত সমূহে তাদের উপরোক্ত বিশ্বাস দুটি খন্ডন করা হয়েছেঃ

(১) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي

الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا-

আপনি বলে দিন, সব প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি নিজের জন্য সন্তান তৈরী করেন নি, না আছে তাঁর সাম্রাজ্যে কোন শরীক, কোন দুর্বলতার কারণে না আছে তাঁর কোন সাহায্যকারী। তাই তাঁরই শ্রেষ্টত্ব ঘোষনা কর।

যদি ওসব মুশরিকরা মালিকত্ব ও হস্তক্ষেপে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অংশিদার মনে না করতো, তাহলে এ ভাবে খন্ডন করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

(২) تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ- اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

জাহান্নামে মুশরিকরা তাদের মূর্তিদেরকে বলবে-আল্লাহর কসম, আমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে ছিলাম। কারণ, আমরা তোমাদেরকে রব্বুল আলামীনের বরাবর মনে করতাম।

যদি মুশরিকরা মুসলমানদের মত আল্লাহকে অন্য কারো শরীক ছাড়া সৃষ্টিকর্তা, মালিক মনে করতো, তাহলে বরাবর মনে করার কি অর্থ হতে পারে?

(৩) اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ-

তাদের কি এমন কিছু দেবতা আছে, যারা তাদেরকে আমার থেকে রক্ষা করতে পারবে? ওরা তো নিজেদের আত্মাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আমার পক্ষ থেকে ওদের কোন সহযোগিতা করা হবে না।

এ আয়াতে মুশরিকদের সেই ধারণা খন্ডন করা হয়েছে যে ওদের দেবতা আল্লাহর মুকাবিলায় ওদেরকে রক্ষা করতে পারে।

(৪) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ- قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

বরং ওরা আল্লাহর মুকাবিলায় কিছু সুপারিশকারী তৈরী করে রেখেছে। আপনি বলুন, যদিওবা ওগুলো কোন কিছুর মালিক না হয় এবং জ্ঞান না রাখে? আপনি বলে দিন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহর হাতে।

এ আয়াতে মুশরিকদের সেই বিশ্বাসকে খন্ডন করা হয়েছে যে ওরা মনে করতো ওদের দেবতা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া জবরদস্তি সুপারিশ করে ওদেরকে আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা করতে পারে। এ জন্যই এ আয়াতে মূর্তিগুলোর মালিকত্ব না থাকার কথা এবং আল্লাহর মালিকত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর রাজ্যে এমন কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

অংশিদার নেই, যে অংশিদারের দাবী নিয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারে।

(৫) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ

ওরা আল্লাহ ছাড়া ওসব জিনিসের পূজা করে, যে গুলো ওদের লাভ-ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। ওরা বলে যে, এ গুলো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।

এ আয়াতেও মুশরিকদের সেই বিশ্বাসকে খন্ডন করা হয়েছে যে ওরা মনে করতো যে ওদের মূর্তিগুলো আল্লাহর কাছে জোরালো সুপারিশ করবে। কেননা ওগুলো আল্লাহর রাজ্যে এবং রাজ্য পরিচালনায় আল্লাহর অংশিদার।

সারকথা হলো আরবের মুশরিকদের শিরক একই রকম ছিল না বরং ওদের মধ্যে পাঁচ ধরণের শিরক ছিল। (১) সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার এবং যুগকে বিশ্বাস করা, (২) কয়েক খোদা মানা, (৩) আল্লাহকে এক মনে করে। তবে তাঁর সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করা, (৪) আল্লাহকে এক মনে করে। তবে ক্লান্ত হয়ে অন্য মাবুদের সাহায্য গ্রহণকারী মনে করা, (৫) আল্লাহকে খালেক-মালেক স্বীকার করে, তবে অন্যদের মূখাপেক্ষী মনে করা। অন্যদেরকে আল্লাহর রাজত্বে ও প্রভূত্বে জড়িত মনে করা। যেমন বর্তমান সরকার প্রধানের জন্য সংসদের সদস্যগণ। এ পাঁচ ধরণের শিরক ছাড়া অন্য আর কোন প্রকারের শিরক প্রমাণিত নেই। এ পাঁচ ধরনের মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদা কুরআন মজিদে খন্ডন করা হয়েছে। এ পাঁচ ভ্রান্ত আকীদার খন্ডন সূরা ইখলাসে এ ভাবে বর্ণিত হয়েছে- قُلْ هُوَ اللّٰهُ (বলুল, আল্লাহ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা) দ্বারা প্রকৃতি পূজারীদের ধারণা খন্ডন করা হয়েছে, اَحَدٌ (এক) দ্বারা ঐ সব মুশরিকদের বিশ্বাসকে খন্ডন করা হয়েছে, যারা দু'খোদার বিশ্বাস করতো, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ (তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনি কারো সন্তান নন) দ্বারা ওসব মুশরিকদের বিশ্বাস খন্ডন করা হয়েছে, যারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও হযরত উজাইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বা ফিরিশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করতো, وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ (তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই) দ্বারা ওসব মুশরিকদের বিশ্বাস খন্ডন করা হয়েছে, যারা সৃষ্টিকর্তাকে পরিশ্রান্ত বলে বিশ্বাস করে অন্যান্য দেবতাদেরকে বিশ্বপরিচালনাকারী মনে করতো।

আপত্তি (১) আরবের মুশরিকরা তাদের মূর্তিগুলোকে কেবল খোদার কাছে সুপারিশকারী এবং খোদা প্রাপ্তির ওসীলা বলে বিশ্বাস করতো। মুসলমানেরাওতো নবী-ওলীগণকে সুপারিশকারী ও ওসীলা মনে করেন। কিন্তু ওরা মুশরিক হয়ে গেল আর এরা

মুমিন রইলো, এর হেতু কি?

জবাব ঃ এতে দুটি কারণ রয়েছে- এক, মুশরিকরা খোদার দুশমনদেরকে অর্থাৎ মূর্তি ইত্যাদিকে সুপারিশকারী ও ওসীলা মনে করতো, যা অবান্তর। আর মুসলমানগণ আল্লাহর মাহবুবগণকে সুপারিশকারী, ওসীলা মনে করেন, যা ন্যায় সঙ্গত। তাই ওরা মুশরিক হয়ে গেছে এবং এরা মুমিন রয়েছেন। যেমন গঙ্গার পানি, পাথরের তৈরী মূর্তির প্রতি সম্মান, হোলি, দেওয়ালী, বেনারস, কাশী ইত্যাদিকে সম্মান করা শিরক। কিন্তু জমজমের পানি, হাজরে আসওয়াদ, মকামে ইব্রাহীম, রমযান, মোহররম, মক্কা মুয়াজ্জমা, মদীনা তৈয়্যবার সম্মান ইত্যাদি ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। অথচ জমজম ও গঙ্গার পানি উভয়টাই পানি এবং হাজরে আসওয়াদ ও পাথরের মূর্তি উভয়টা পাথর।

দুই, মুশরিকরা তাদের দেবতাদেরকে খোদার মুকাবিলায় প্রভাবশালী সুপারিশকারী ও ওসীলা মনে করতো। কিন্তু মুসলমানগণ নবী-ওলীগণকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে মনে করে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ সুপারিশকারী ও ওসীলা মনে করেন। উল্লেখ্য যে অনুমতি ও মুকাবিলা যথাক্রমে ঈমান ও কুফরের পরিমাপক।

আপত্তি নং (২) আরবের মুশরিকদের মুশরিক এ জন্য বলা হতো যে তারা মখলুককে ফরিয়াদ গ্রহনকারী,বিপদমুক্তকারী, সুপারিশকারী, মনোবাঞ্ছাপুর্নকারী, দূরের আহ্বান শ্রবনকারী,অদৃশ্যজ্ঞানী ও ওসীলা মানতো। ওরা তাদের মূর্তিদেরকে সৃষ্টি কর্তা মালেক, রিজিক দাতা, হায়াত ও মৃত্যুদানকারী মনে করতো না। আল্লাহর বান্দা মনে করেই এ পাঁচটি ক্ষমতা ওদের মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করতো।কিন্ত কুরআনের ফতোয়া দ্বারা ওরা মুশরিক হয়ে গেছে।তাই বর্তমান যুগের মুসলমানদের মধ্যে যারা নবী ওলীগনের বেলায় উপরোক্ত বিষয়গুলো বিশ্বাস করে,ওরাও ওদের মত মুশরিক বলে গন্য হবে, যদিওরা ওনাদেরকে খোদার বান্দা (মখলুক) মনে করে উপরোক্ত ধারনা পোষন করে।

জবাব ঃ এটা নিছক ভ্রান্ত ও কুরআনের অপব্যাখ্যা মাত্র। আল্লাহর সাথে বান্দাকে বরাবর মনে না করলে কিছুতেই শিরক হতে পারে না। মুশরিকরাতো মুর্তিগুলোকে আল্লাহর গুনে গুনান্বিত মনে করতো।আর মুসলমানগন নবী-ওলীগনকে আল্লাহর অনুমতিতে আল্লাহর বান্দা মনে করে সাহায্যকারী হিসেবে বিশ্বাস করে।তাই তারা মুমিন হিসেবে গন্য। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের এসব গুনাবলি কুরআন করীমে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন- আমি আল্লাহর হুকুমে মৃতদেরকে জীবিত,অন্ধ এবং কুষ্ঠরোগী ভাল করতে পারি। আমি আল্লাহর হুকুমে মাটির তৈরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাখিতে ফুঁক দিয়ে জীবিত পাখী বানাতে পারি। তোমরা ঘরে বসে যা খাও বা রেখে দাও, তা আমি বলতে পারি।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছেন– আমার জামা আমার আব্বাজানের চোখে লাগাবেন, উনিদৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালামকে বলেছেন - আমি আপনাকে সন্তান দান করবো।

এ সব বক্তব্যে কোন মাধ্যম ব্যতীত বিপদ মুক্তকরন, হাজত পূরন, অদৃশ্য জ্ঞান সব কিছু বান্দার ক্ষেত্রে প্রমাণিত হলো। হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামের ঘোড়ার পদধূলি গোবাচুরের মূর্তির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেছিল। এটাও মাধ্যম বিহীন জীবন দান। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি তারই হাত মুবারকের বরকতে মূহূর্তে জীবিত সাপ হয়ে যেত। হযরত আসফ চোখের পলক মারার আগেই ইয়ামন থেকে সিরিয়ায় বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে এসেছেন। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম তিন মাইলের দূরত্ব থেকে পিপীলিকার আওয়াজ শুনেছেন। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কেনানে অবস্থান করে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে মিশরে তালাবদ্ধ সাত কামরার সর্বশেষ কামরায় খারাপ ধারণা থেকে রক্ষা করেছেন। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম রূহ গুলোকে হজ্বের জন্য আহবান করেছিলেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত আগত রূহ সমূহ শুনেছিলেন। এসব মুজিজা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত।

ইনশাআল্লাহ আহকামুল কুরআন অধ্যায়ে এ আয়াতগুলো পেশ করা হবে। আপত্তিকারীদের মতেতো এ সব শিরক। অথচ এগুলো কুরআন স্বীকৃত মুজিজা ও কারামত, যা কোন মাধ্যম ব্যতীত প্রমাণিত। যদি কোন মাধ্যম ছাড়া হস্তক্ষেপ করা শিরক হয়ে যায়, তাহলে প্রত্যেক মুজিজা, কারামত স্বীকার করা শিরক হবে। কুরআন দ্বারা প্রমাণিত ও নবী-ওলীগণের বিশ্বাসে ধন্য এ ধরণের শিরককে আমরা মোবারকবাদ জানাই।

পার্থক্য হলো আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ এ সব বিষয় বান্দার জন্য স্বীকার করা শিরক নয়, তবে আল্লাহর মুকাবিলায় মান্য করা শিরক। নবী-ওলীগণের মুজিজা ও কারামততো আছেই, তা ছাড়া আজরাইল আলাইহিস সালাম ও তাঁর সহযোগী অন্যান্য ফিরিশতাগণ একই সময় সারা বিশ্ব অবলোকন করেন এবং প্রত্যেক জায়গায় একই সময় হস্তক্ষেপ করেন। আল্লাহ তাআরা ফরমান–

(১) قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ

আপনি বলে দিন, তোমরা সবাইকে মৃত্যুর ফিরিশতা মৃত্যু দান করবে, যাকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করা হযেছে।

(২) حَتّٰى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ

শেষ পর্যন্ত যখন ওদের কাছে আমার মৃত্যুদূত আসবে, ওদেরকে মৃত্যু দান করার জন্য।

অভিশপ্ত ইবলিসকে এ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে সে ও তার বংশধররা গোমরাহ করার জন্য সবাইকে একই সময় দেখে থাকে। আল্লাহ তাআলা ফরমান–

(৩) إِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

সেই শয়তান ও তার বংশধর তোমরা সবাইকে ওখান থেকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা ওদেরকে দেখতে পাও না।

যে ফিরিশতাদ্বয় কবরে সওয়াল-জবাব করেন, যে ফিরিশতা মায়ের পেটে সন্তান তৈরী করেন, তাঁরা সবাই দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং খোদা প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা রাখেন। নতুবা কোন মাধ্যম ব্যতীত এত বড় কাজ আঞ্জাম দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। 'জাওয়াহেরুল কুরআন' এর সেই ফত্ওয়া অনুসারে ইসলামী আকাইদ শিরক হয়ে গেছে। পার্থক্য শুধু সেটাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর মুকাবিলায় এ শক্তি বিশ্বাস করাটাই শিরক। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ও অনুমতি সাপেক্ষ এ সব ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা একেবারে ঈমান সম্মত।

বিদআত

বিদআতের আভিধানিক অর্থ– নতুন বিষয়। শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত হচ্ছে ছওয়াবের আশায় ধর্মে নতুন কোন কিছু প্রচলন করা। যদি সেটা শরীয়ত বিরোধী হয়, তাহলে হারাম আর যদি শরীয়ত বিরোধী না হয়, তাহলে বৈধ। কুরআন মজিদে বিদআত শব্দটি এ দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

(১) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন সমূহের সৃষ্টিকর্তা।

(২) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

বলে দিন, আমি নতুন রসূল নই।

এ দু'আয়াতে বিদআত শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ নতুন উদ্ভাবন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً وَّرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ

pdf By Syed Mostafa Sakib

رِعَايَتِهَا فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ

ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অনুসারীদের মনে আমি কোমলতা ও রহমত রেখেছি এবং বৈরাগ্য যেটা ওরা ধর্মের মধ্যে নিজেদের থেকে উদ্‌ভাবন করেছে, সেটা আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলাম না। তবে তারা এ নব উদ্‌ভাবন (বিদ্‌আত) আল্লাহর রেজামন্দির আশায় করেছে। পরে তারা সেটা যথাযথ ভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার আমি তাদেরকে সেটার ছওয়াব দান করেছি। তাদের মধ্যে অনেকেই ফাসিক।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে ঈসায়ীগণ সন্যাস প্রথা এবং সংসার ত্যাগ নিজেরাই উদ্‌ভাবন করেছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ কাজের নির্দেশ দেন নি। উত্তম বিদ্‌আত হিসেবে তারা এ কাজ উদ্‌ভাবন করেছিল। আল্লাহ তাআরা তাদেরকে এ নব কাজের ছওয়াব দান করেছেন। কিন্তু যারা এটা যথাযথ পালন করেনি বা যারা ঈমান ত্যাগ করেছে, তারা শাস্তির অধিকারী হয়ে গেছে। এতে বুঝা গেল, ধর্মে এমন কোন কিছু নতুন প্রচলন করা, যেটা ধর্মের বিপরীত নয়, সেটা ছওয়াবের সহায়ক কিন্তু সেটা সব সময় পালন করা চায়। যেমন, ছয় কলেমা, নামাযে মুখে নিয়ত করা, কুরআনের রুকূ ইত্যাদি, জ্ঞান অর্জন, হাদীছ পাঠ, মিলাদ মাহফিল, খতমে বুজুর্গান এ সব বিষয় যদিওবা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যুগের পরে উদভাবন হয়েছে, কিন্তু ধর্মের বিপরীত নয় বরং ধর্মের সহায়ক হওয়ায় ওসব কাজে ছওয়াব রয়েছে। হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, যে ইসলামে ভাল কাজের প্রচলন করবে, সে অনেক ছওয়াবের ভাগী হবে।

اِلٰه–ইলাহ

কুরআন শরীফের পরিভাষা সমূহের একটি হচ্ছে 'ইলাহ'। এটা সম্পর্কে যথাযথ জানাটা মুসলমানদের জন্য খুবই জরুরী। কেননা এ শব্দটি কলেমাতে রয়েছে। যেমন– لَآ اِلٰهَ اِلَّا (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)। নামাযের শুরুতেই পড়তে হয় لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ (হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই)। মোট কথা, ঈমান, নামায বরং সমস্ত আমলই ইলাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের উপর নির্ভর। যদি ইলাহ্ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকে, তাহলে ইলাহ দাবীদার অন্যদেরকে কি করে প্রতিহত করবে এবং আল্লাহর প্রমাণ কি দিয়ে করবে? তাই এ সম্পর্কে জানাটা একান্ত প্রয়োজন।

ইলাহ সম্পর্কে আমি তিনটি বিষয় উল্লেখ করছি–

(১) ইলাহের অর্থ ওহাবীরা কি বুঝেছে এবং এতে এরা কি ভুল করেছে।

(২) কুরআন ও শরীয়তে ইলাহের পরিচয় কি? অর্থাৎ হক ও বাতিল ইলাহ কি ভাবে সনাক্ত করবে?

(৩) উলুহিয়াত (খোদায়িত্ব) কিসের উপর নির্ভরশীল? অর্থাৎ এমন কোন্ বৈশিষ্ট্য যেটা পাওয়া গেলে খোদা মানতে হয়।

এ তিনটা বিষয়ে খুবই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করা উচিত।

(১) ওহাবীরা মনে করে যে দু'জিনিসের উপর ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা নির্ভর করে- অদৃশ্য জ্ঞান ও সরাসরি যে কোন চাহিদার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখা অর্থাৎ যার ব্যাপারে এ বিশ্বাস রয়েছে যে, যিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী এবং কোন বাহ্যিক মাধ্যম ছাড়া জগতের যে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, হাজত পূর্ণ করতে পারেন এবং মুশকিল আসান করতে পারেন, তিনিই ইলাহ।

(জাওয়াহেরুল কুরআন–১১২ পৃঃ, প্রণেতা- মওলভী গোলাম খান সাহেব)

এ বক্তব্য দ্বারা ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য যে, যে সব সাধারণ মুসলমানেরা নবী ও ওলীগণকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করে এবং কোন মাধ্যম ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে কলেমার অস্বীকারকারী ও মুশরিক বলা। কিন্তু তাদের এ বক্তব্য একেবারে ভ্রান্ত এবং কুরআনের বিপরীত। এমন কি সাহাবায়ে কিরাম ও সাধারণ মুসলমানদের আকীদারও বিপরীত। কুরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, ফিরিশতাগণ আল্লাহর অনুমতিতে পৃথিবীতে হস্তক্ষেপ করেন। কেউ জীবিতকে মৃত দান করেন, কেউ মায়ের গর্ভে বাচ্চা তৈরী করেন, কেউ বৃষ্টি বর্ষন করেন, কেউ কবরে হিসেব নেন। এ সব কাজ কোন মাধ্যম ছাড়া করে থাকেন। তাই ওহাবীদের মাপকাঠি অনুযায়ী এ সব ফিরিশতাগণ ইলাহ হয়ে গেছে। অনুরূপ নবীগণ কোন মাধ্যম ছাড়া হাজত পূর্ণ ও মুশকিল আসান করেন যেমন হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) অন্ধ ও কুষ্ট রোগীদেরকে আরোগ্য করতেন এবং মৃতদের জীবিত করতেন। হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) স্বীয় জামা দ্বারা আল্লাহর হুকুমে অন্ধকে দৃষ্টি শক্তি দান করেন। এ রকম অনেক উদাহরণ রয়েছে। ওদের ভাষ্য অনুযায়ী ওনারা ইলাহ হিসেবে গণ্য হলো এবং ওনাদের অনুসারীরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহের অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হলো। হযরত আসফ বরখিয়া বিলকিসের সিংহাসন চাখের পলকে সিরিয়ায় নিয়ে আসেন। তাই তিনিও ইলাহ হয়ে গেছেন। মোট কথা ওদের মাপকাঠি মতে কুরআনকে মান্যকারী কেউ মুসলমান হতে পারে না। সম্ভবতঃ জওয়াহেরুল কুরআনের লেখক ইলাহ'র এ অর্থ অচেতন ও নেশাগ্রস্থ অবস্থায় লিখেছে।

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কিত আয়াত ইন্‌শা আল্লাহ তৃতীত অধ্যায়ে পেশ করা হবে।

(২) বরহক ইলাহের প্রধান পরিচয় হচ্ছে, যাকে নবীর মুখে ইলাহ বলা হয়েছে, তিনিই বরহক ইলাহ এবং নবী যার খোদায়িত্বকে অস্বীকার করেছেন, সে বাতিল ইলাহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমস্ত কাফিরেরা চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি ও পাথরকে ইলাহ বলেছে কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সে গুলো অস্বীকার করেছেন। তাই সবই মিথ্যা, নবীর দাবীই সত্য। খোদা তাআলার খোদায়িত্ব ফেরাউনের অনুসারীরা অস্বীকার করেছে কিন্তু হযরত মূসা কলিমুল্লাহ (আলাইহিস সালাম) স্বীকার করেছেন। সকল ফেরাউনী গোষ্ঠীর বক্তব্য মিথ্যা, মূসা (আলাইহিস সালাম) এর বক্তব্য সত্য। ইলাহ চেনার এর থেকে বড় দলীল নেই। নবী হচ্ছেন ইলাহ চেনার প্রধান ও সুস্পষ্ট দলীল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

(১) اُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ– قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ– رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ

অতঃপর যাদুগরদেরকে সিজদায় ফেলে দেয়া হলো। তারা বললো আমরা সেই বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যিনি হযরত মূসা ও হারুনের প্রতিপালক।

দেখুন, এখানে রব্বুল আলামীনের পরিচয়ে বলা হয়েছে– যিনি মূসা ও হারুনের প্রতিপালক। অন্যথায় ফেরাউন বলতে পারতো, রব্বুল আলামীনতো আমিই, এরা আমার উপর ঈমান আনতেছে। ফেরাউন নীল নদে ডুবার সময় বলেছিল-

(২) اٰمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ

আমি হযরত মূসা ও হারুনের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।

ফেরাউনও প্রতিপালকের পরিচয় সেই দু'পয়গাম্বরের মাধ্যমে দিল। অবশ্য ওর ঈমান কবুল হয়নি। কারণ ঈমান আনার সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। সে আযাব দেখে ঈমান এনেছিল।

(৩) اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ– قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَاۤئِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحَاقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا

যখন হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞেস করলেন- আমার ইন্তেকালের পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তাঁরা বললেন, আপনার ও আপনার বাপ দাদা ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাক (আলাইহিস সালাম) এর প্রতিপালকের ইবাদত করবো।

হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) এর সন্তানগণও সত্য ইলাহের পরিচয় দিতে গিয়ে এটাই আরয করেছেন যে পয়গাম্বরগণের বর্ণিত ইলাহই সত্য ইলাহ। যেমন রোদ্র সূর্যের বড় প্রমাণ। অনুরূপ নবীগণ নূরে ইলাহীর সর্বোৎকৃষ্ট ঝলক। ওনাদের বাণী আল্লাহ

তাআলার মজবুত প্রমান। যদি কেউ নবীর বাণীকে অগ্রাহ্য করে স্বীয় বিদ্ধা বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহকে জানে, সে মুমিনও নয় এবং একেশ্বরবাদীও নয়।

ইলাহ শব্দের ব্যাখ্যা

'ইলাহ' শব্দটি 'ইলাহুন' শব্দ থেকে গঠন করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সর্বশেষ উচ্চতা বা হতবুদ্ধিতা। ইলাহ হচ্ছেন তিনি, যিনি সর্বোচ্চ বা যার সত্ত্বা বা গুনাবলীর ব্যাপারে সৃষ্টিকুলের জ্ঞান বুদ্ধি অচল হয়ে যায়। কুরআনের পরিভাষায় ইলাহ অর্থ ইবাদতের যোগ্য অর্থাৎ মাবুদ। যেখানেই ইলাহ শব্দ থাকবে, এর অর্থ হবে মাবুদ। لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযোগী সেই হবেন, যার মধ্যে সৃষ্টি করা, রিযিকদান, জিন্দেগী, মৃত্যুর মালিক হওয়া, মখলুকের গুনাবলী যথা পানাহার, মৃত্যুবরণ, শোয়া, দোষের অধিকারী ইত্যাদি থেকে পবিত্র হওয়া, সত্বাগত ভাবে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, বিশ্বের আসল মালিক হওয়া ইত্যাদি যোগ্যতা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

(১) اَمِ اتَّخَذُوْۤا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ

তারা কি পৃথিবীর মধ্যে থেকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে? সেই মাবুদ কি কিছু সৃষ্টি করতে পারে?

অর্থাৎ সেই মূর্তি গুলোর মধ্যে সৃষ্টি করার কোন যোগ্যতা নেই, কেননা ওগুলো স্বয়ং সৃষ্ট। অতএব এ গুলো মাবুদ নয়।

(২) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি অন্যদের তত্ত্বাবধায়নকারী চির জীবিত। তাঁকে না তন্দ্রাভাব, না নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে। আসমান যমীনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর।

(৩) وَمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ

ওনার সাথে কোন মাবুদ নেই। যদি থাকতো, তাহলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ মখলুক নিয়ে যেত।

(৪) وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا

তারা আসল খোদাকে বাদ দিয়ে এমন খোদা গ্রহণ করেছে, যে কিছু সৃষ্টি করতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পারেনা এবং নিজেই সৃষ্ট, যে নিজের জানের লাভ-ক্ষতির মালিক নয় এবং যে জীবন মৃত্যু, ও পুনরুত্থানের মালিক নয়।

এ রকম অনেক অনেক আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে আসল ইলাহ উপরোক্ত গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল। মুশরিকদের মূর্তিগুলো এবং আল্লাহ তাআলার অন্যান্য বান্দাদের মধ্যে যেহেতু এ সব গুনাবলী নেই এবং মখলুকের গুনাবলী যথা- খানা পিনা, জীবন মৃত্যু, শোয়া, সন্তানের অধিকারী হওয়া ইত্যাদি মওজুদ আছে, সেহেতু তারা ইলাহ হতে পারে না।

وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ

ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর মা একান্ত সত্যবাদী ছিলেন। তাঁরা উভয়ে খাবার খেতেন।

অর্থাৎ ঈসা ও তাঁর মা যেহেতু খাবার খেতেন, সেহেতু ইলাহ নয়।

আরবের মুশরিকরা তাদের দেবতাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশ্বাস করতো, তাই এ বিশ্বাসের কারণে মুশরিক হয়ে গেছে।

(১) রব তাআলার মুকাবিলায় অন্যদের আনুগত্য করাকে হক মনে করা অর্থাৎ ওদের দেবতা যা বলে সেটাই হক। যদিওবা তা রবের বিপরীত হয়।

(ক) اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا

তুমি কি দেখেছ, যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তুমি কি তার দেখা শুনার জিম্মাদার হবে?

(খ) اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا

খৃষ্টানেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পাদরী ও সন্যাসীদেরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে এবং মরিয়মের বেটা মছিহকেও খোদা বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাদেরকে এক ইলাহের ইবাদত করা ছাড়া এ সবের হুকুম দেয়া হয়নি।

উল্লেখ্য যে, খৃষ্টানেরা তাদের প্রবৃত্তিকে এবং তাদের পাদরীদেরকে খোদা মানত না। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলার মুকাবিলায় ওদের আনুগত্য করেছে, সেহেতু ওদেরকে যেন ইলাহ বানিয়ে নিল।

(২) কাউকে এ রকম মনে করা যে আমাদেরকে সে আল্লাহর মুকাবিলায় আজাব থেকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আজাব দিতে চাইলে সে আজাব দিতে দিবে না।

اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ

তাদের কি এমন কিছু খোদা আছে, যারা ওদেরকে আমার মুকাবিলায় আমার থেকে বাঁচাবে? ওরাতো নিজেদের জানকেও বাচাঁতে পারে না এবং আমার পক্ষ থেকেও ওদের কোন সাহায্য করা হবে না।

(৩) কাউকে বিপদকালীন এমন সুপারিশকারী মনে করা, যে আল্লাহ তাআলার মুকাবিলায় তাঁর মর্জির বিরুদ্ধে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। যেমন–

(ক) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ – قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا

তারা কি আল্লাহর মুকাবিলায় সুপারিশকারী মনোনিত করে রেখেছে? বলে দিন, সেই সুপারিশকারী কি কোন কিছুর মালিক না হলেও এবং অজ্ঞ হলেও? বলে দিন, সকল সুপারিশতো আল্লাহর হাতে।

(খ) مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

সে কে, যে আল্লাহর কাছে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে সুপারিশ করতে পারে?

(৪) কাউকে সুপারিশকারী মনে করে পূজা করা ও সিজদায়ে ইবাদত করা। যেমন-

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ–

ওরা আল্লাহ ব্যতীত ওসব জিনিসের পূজা করে, যে গুলো না উপকার করতে পারে, না অপকার। এবং ওরা বলে যে এ গুলো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।

(৫) কাউকে আল্লাহর সন্তান মনে করা। অতঃপর ওর আনুগত্য করা। যেমন-

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ–

সেই মুশরিকরা জ্বীনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে অথচ তিনিই ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা আল্লাহর জন্য বেটা বেটি সাব্যস্ত করে নিয়েছে।

মোট কথা কাউকে ইলাহ মনে করা মানে আল্লাহর বরাবর মনে করা। বরাবর

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলতে তাই বুঝায়, যা উপরোক্ত আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে। আমরা আল্লাহর মখলুককে শ্রবণকারী, দর্শনকারী, জীবিত, ক্ষমতাবান, মালেক, জিম্মাদার, বিচারক, প্রত্যক্ষদর্শী ও হস্তক্ষেপকারী মনে করি। কিন্তু এর জন্য আমরা মুশরিক নই। কেননা এ সব গুনাবলীর ব্যাপারে কাউকে আল্লাহর বরাবর মনে করি না।

আপত্তি নং-১ ঃ আল্লাহ তাআলা মূর্তি, নবী ও ওলীগণ সম্পর্কে ইরশাদ ফরমান–

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

তাদের জন্য কোন ইখতিয়ার নেই। ওরা যা শিরক করে, আল্লাহ ওটা থেকে পবিত্র ও অনেক উর্ধে।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল কাউকে কোন কিছুর অধিকারী মনে করা শিরক। তাই নবী ও ওলীগণকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী মনে করাও শিরক।

জবাব ঃ উপরোক্ত আয়াতে ইখতিয়ার বলতে সৃষ্টি করার ইখতিয়ার বুঝানো হয়েছে। এ জন্য ইরশাদ করা হয়েছে-

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

আপনার প্রভূ যা ইচ্ছে করেন, তা সৃষ্টি করেন এবং ক্ষমতা রাখেন। ওদের কোন ইখতিয়ার নেই।

এখানে ক্ষমতা বলতে আল্লাহর মুকাবিলায় ক্ষমতা রাখার কথা বুঝানো হয়েছে। নচেৎ আপত্তিকারীরাও রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের ক্ষমতার কথা বিশ্বাস করে এবং ওদেরকে ভয় করে।

আপত্তি নং-২ ঃ আল্লাহ তাআলা নবী, ওলী ও মূর্তিদের প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন–

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

ওরা আল্লাহ ছাড়া ও সব জিনিসের পূজা করে, যে গুলো না উপকার করতে পারে, না অপকার।

বুঝা গেল যে, কাউকে উপকারী বা অপকারী মনে করাটা ইলাহ মানার নামান্তর। তাই নবী ও ওলীগণকে যারা উপকারী ও অপকারী মনে করে, তারাও মুশরিক।

জবাব ঃ ও সব আয়াতে রব তাআলার মুকাবিলায় উপকারকারী মনে করাটা বুঝানো হয়েছে। যেমন- এ রকম মনে করা যে আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষতি করতে চান কিন্তু নবী আমাদের উপকার করবেন। নিম্নের আয়াতে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর রয়েছে–

وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَالَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهٖ

যদি আল্লাহ তোমাদেরকে অপদস্থ করেন, তা হলে এর পরে তোমাদেরকে কে সাহায্য করবে?

নতুবা ওরাওতো রাজা-বাদশাহ ও শাসকদেরকে বরং সাপ-বিচ্ছু ঔষুধ-পত্রকে উপকারী ও অপকারী মনে করে। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ ফরমান–

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ – وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ–

যদি তোমাকে আল্লাহ কষ্ট দেন, তাহলে তিনি ছাড়া (সেই কষ্ট) অপসারনকারী অন্য কেউ নেই এবং তোমাকে যদি কল্যাণ দান করেন, (তাও কেউ অপসারনকারী নেই) অতএব তিনি প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

এ আয়াত ওসব আয়াতের তফসীর, যে সব আয়াতে উপকার অপকারের কথা বলা হয়েছে। অতএব ওসব আয়াতে আল্লাহর মুকাবিলায় উপকার-অপকারের কথা বুঝানো হয়েছে।

আপত্তি নং-৩ ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا

ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন, হে আব্বাজান, আপনি ওটাকে কেন পূজা করেন, যেটা না শুনতে পায়, না দেখতে পায়, না আপনার কোন মসিবত দূর করতে পারে।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে কাউকে অদৃশ্য আহবান শ্রবনকারী, অদৃশ্য দর্শনকারী, উপকার ও অপকারকারী মনে করা 'ইলাহ' মানার মত, যেটা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। নবী ও ওলীগণের মধ্যে এ সব গুণ আছে বলে বিশ্বাস করাটা ওনাদেরকে ইলাহ মনে করার পর্যায়ভূক্ত।

জবাব ঃ এ আয়াতে দূর থেকে দেখার বা শুনার কথা কোথায় উল্লেখ আছে? এখানেতো কাফিরদের বোকামীর কথাই উল্লেখিত হয়েছে। ওরা এমন পাথর সমূহের পূজা করে, যে গুলোর মধ্যে দেখার বা শ্রবণ করার কোন শক্তি নেই। আয়াতের ভাবার্থ এ নয় যে, যে দেখে বা শুনে, সে খোদা। তাহলেতো প্রত্যেক জীবিত মানুষ খোদা হিসেবে গণ্য হওয়া চায়, কেননা সে দেখে ও শুনে- فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا। (আমি মানুষকে শ্রবণকারী ও দর্শনকারী করেছি) আল্লাহ তাআলা আরও

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইরশাদ ফরমান–

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَمْشُوْنَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبْطِشُوْنَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُبْصِرُوْنَ بِهَا

ও সব মূর্তিদের কি এমন পা আছে, যেটা দিয়ে চলতে পারে, এমন কোন হাত আছে, যেটা দিয়ে ধরতে পারে, এমন কোন চোখ আছে, যেটা দিয়ে দেখে?

এ আয়াতেও ও সব কাফিরদের বোকামীর কথা উল্লেখিত হয়েছে, যারা হাত-পা ও চক্ষুহীন সৃষ্ট বস্তুর পূজা করে। অথচ ওসব মূর্তিদের থেকে ওরা নিজেরাই অনেক উত্তম। কারণ ওদের সচল হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি রয়েছে। এর ভাবার্থ এ নয় যে, যার চোখ কান আছে, সে খোদা বলে গণ্য হবে।

আপত্তি নং- ৪ ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى– اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

যদি তুমি উচ্চস্বরে কথা বল, তাহলে তিনি গোপন ও নিম্নস্বরের কথা জেনে নেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে উচ্চ, নিম্ন প্রকাশ্য-গোপন সব কথা জানাটা হচ্ছে আল্লাহর শান। যদি নবী ওলীর মধ্যে এ ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হয়, তাহলে ওনাদেরকে ইলাহ মানা হলো এবং এটা শিরক হয়ে গেল।

জবাব ঃ আল্লাহ তাআলার এ গুনাবলী সত্ত্বাগত স্থায়ী ও অবিনশ্বর। এ রকম গুনাবলী অন্য কারো মধ্যে আছে বলে মনে করা শিরক। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় জানার ক্ষমতা দান করেছেন। এ ধরণের ক্ষমতা অন্যদের মধ্যে আছে বলে মনে করাটা শিরক নয় বরং প্রকৃত ঈমান সম্মত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

বান্দার কোন কথা মুখ থেকে বের হতে পারে না কিন্তু ওর কাছে একজন সংরক্ষক প্রস্তুত হয়ে বসে আছে।

অর্থাৎ আমলনামা লিখক ফিরিশতা মানুষের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন কথা লিখেন। যদি সেই ফিরিশতার প্রত্যেক প্রকাশ্য ও গোপন কথার জ্ঞান না থাকতো, তাহলে কিভাবে লিখে?

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ

অবশ্যই তোমাদের জন্য পর্যবেক্ষনকারী সম্মানিত লিখক রয়েছে। তোমরা যা কিছু কর তাঁরা প্রত্যেক কিছু জানেন।

বুঝা গেল যে, আমল নামা সম্পাদনকারী ফিরিশতাগণ আমাদের গোপন ও প্রকাশ্য আমল সমূহ জানেন। তা না হলে, কি করে লিখেন?

আপত্তি নং- ৫ ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا

মানবজাতির কিছু পুরুষ জ্বিনজাতির কিছু পুরুষের আশ্রয় নিত। এতে ওদের অহংকার আরো বৃদ্ধি পেল।

এতে প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আশ্রয় নেয়া কুফর ও শিরক। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ ফরমান- وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ

সেই আল্লাহ আশ্রয় দেন এবং তিনি আশ্রিত নয়।

জবাব ঃ এ সব আয়াতে আল্লাহর মুকাবিলায় আশ্রয় নেয়া বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর অনুমতিতে তাঁর বান্দাদের আশ্রয় নেয়া বুঝানো হয়নি। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا–

যদি এ সব লোক নিজেদের জানের উপর জুলুম করে আপনার কাছে আসে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আপনিও তাদের মাগফিরাতের জন্য দুআ করেন, তাহলে আল্লাহকে তওবা কবুলকারী মেহেরবান পাবে।

যদি এ অর্থ বুঝানো না হয়, তাহলে আমরা যে শীত-গ্রীষ্মের সময় কাপড় ও বাড়ীর আশ্রয় গ্রহণ করি, অসুখের সময় ডাক্তারের সাহায্য লই, বিচারের জন্য বিচারকের আশ্রয় লই, সবই শিরক হয়ে যাবে।

আপত্তি নং- ৬ ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইলমে গায়বের অধিকারী মনে করা শিরক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

বলে দিন, আসমান-যমীনের মধ্যে যারা আছে, ওদের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেউ গায়েব জানে না।

ইলমে গায়ব হচ্ছে খোদায়ীত্বের দলীল। কাউকে ইলমে গায়বের অধিকারী মনে করা মানে তাকে ইলাহ মেনে নেয়া। (জাওয়াহেরুল কুরআন)

জবাব ঃ যদি ইলমে গায়েব খোদায়ীত্বের দলীল হয়, তাহলে প্রত্যেক মুমিন ইলাহ হিসেবে গণ্য। কেননা অদৃশ্য বিষয়ের উপর ঈমান আনা ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারে না। يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (অদৃশ্য বিষয়ের উপর ঈমান আনে) এবঙ জ্ঞান ছাড়া ঈমান অসম্ভব। আর্পত্তিকারীর কথা মতে আজরাইল (আলাইহিস সালাম) ইবলিস, তকদীর লিখক ফিরিশতাও ইলাহ হয়ে গেছে। কারণ ওদেরকে অনেক অদৃশ্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَاتَرَوْنَهُمْ (সেই ইবলিস ও তার বংশধরেরা তোমাদেরকে এমন ভাবে দেখে যে তোমরা ওদেরকে দেখতে পাও না।) ইলমে গায়েব সম্পর্কে না-হাঁ উভয় প্রকারের আয়াত রয়েছে। 'না' সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা স্থায়ী ও সত্ত্বাগত অদৃশ্য জ্ঞান বুঝানো হয়েছে এবং হাঁ সূচক আয়াত দ্বারা প্রদত্ত জ্ঞান বুঝানো হযেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

(১) وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

শুক্না, ভেজা কোন জিনিস বাদ নেই। সবই সেই উজ্জ্বল লওহে মাহফুজে আছে।

(২) وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ

কুরআন লওহে মাহফুজের ব্যাখ্যা। এতে কোন সন্দেহ নেই।

(৩) نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

আমি আপনার উপর সমস্ত জিনিসের সুস্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত কুরআন অবতীর্ণ করেছি।

যদি কাউকে অদৃশ্য জ্ঞান না দেয়ার ইচ্ছে থাকতো, তাহলে লওহে মাহফুজে লিখা হলো কেন? আর যখন লিখা হলো তখন লওহে মাহফুজের হেফাজতে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ তা নিশ্চয় জানেন। তাহলে তো ওনারা সবাই ইলাহের পর্যায়ভূক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান।

(১) اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ

আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম নেই।

(২) لَاتَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ وَكِيْلًا

আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উকীল বানিওনা।

(৩) وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

আল্লাহ যথার্থ হিসেব গ্রহণ কারী।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ মতে উকীল হওয়া, হাকিম হওয়া, হিসেব রক্ষক হওয়াটা খোদায়িত্বের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা উচিত। সুতরাং স্বত্ত্বাগগত ও প্রদত্ত-এ বিভাজন ছাড়া উপায় নেই।

ولی – ওলী

ওলী (ولی) শব্দটি আরবী وَلْىٌ বা وَلَايَةٌ থেকে গঠিত। وَلْىٌ এর অর্থ নৈকট্য ও وَلَايَةٌ এর অর্থ সহায়তা। তাই ওলী শব্দের শাব্দিক অর্থ নৈকট্য লাভকারী বা সাহায্য কারী। কুরআন শরীফে ওলী শব্দটি বন্ধু, আত্নীয়, সাহায্যকারী, অভিভাবক, উত্তরাধিকারী, মাবুদ, মালিক, হেদায়াতকারী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

(১) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ-

তোমাদের বন্ধু বা সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং সে সব মুমিনগণ, যারা নামায পড়ে, যাকাত দেয় এবং রুকু করে।

(২) نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ -

আমিই দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের বন্ধু।

(৩) فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ -

নবীর সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ ও নেককার মুমিনগণ। অতপর সাহায্যকারী হলেন ফিরিশতাগণ।

(৪) وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

আপনার কাছ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক বানিয়ে দিন এবং আপনার কাছ থেকে বানিয়ে দিন সাহায্যকারী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ

নবী মুসলমানদের জানের তুলনায় অধিক আপন ও মালিক এবং তাঁর স্ত্রীগণ ওদের মাতৃতুল্য।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে ওলী নিকটতম, দোস্ত, সাহায্যকারী ও মালিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৬) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ-

নিশ্চয় ওসব লোক, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা ওদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারা পরস্পরের উত্তরাধিকারী।

এ আয়াতে ওলী উত্তরাধিকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ইসলামের গোড়ার দিকে আনছার ও মুহাজিরগণকে একে অপরের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

(৭) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا-

যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, তারা ওদের উত্তরাধিকার থেকে কিছুই পাবে না, যতক্ষন না হিজরত করে।

এ আয়াতেও ওলী উত্তরাধিকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ইসলামের প্রারম্ভে মুহাজির নয় এমন কেউ মুহাজিরের উত্তরাধিকারী হতে পারতো না।

(৮) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

কাফিরেরা একে অপরের উত্তরাধিকারী।

(৯) وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ

নিকট আত্মীয়গণ একে অপরের উত্তরাধিকারী।

(১০) فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ

আমাকে আপনার কাছ থেকে এমন কোন উত্তরাধিকারী প্রদান করুন, যে আমার ও ইয়াকুবের বংশধরের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত হয়।

এ আয়াত সমূহেও ওলী দ্বারা উত্তরাধিকারী বুঝানো হয়েছে।

(১১) اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ-

আল্লাহ তাআলা মুমিনগণের সাহায্যকারী। তিনি ওনাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং কাফিরদের সাহায্যকারী হলো শয়তান। সে ওদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

এ আয়াতে ওলী সাহায্যকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কতেক আয়াতে ওলী মাবুদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

(১২) وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং বলে যে আমরা ওগুলোর শুধু এ জন্য পূজা করি যেন আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যতর করে দেয়।

এ আয়াতে ওলী মাবুদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা বাক্যের শুরুতে বলা হয়েছে مانعبدهم (আমরা ওগুলোর পূজা করি না।)

(১৩) اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَآءَ- اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا-

কাফিরেরা কি এটা মনে করেছে যে আমাকে ছাড়া আমার বান্দাদেরকে মাবুদ বানিয়ে নিবে? নিশ্চয় আমি কাফিরদের মেহমানদারীর জন্য দোযখ তৈরী করে রেখেছি।

এ আয়াতেও ওলী মাবুদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ওসব ওলী (মাবুদ) গ্রহণকারীদের কাফির বলা হয়েছে। অথচ কাউকে বন্ধু বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করলে কাফির হয় না।

(১৪) مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا-

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উদাহরণ হলো সেই মাকড়সার মত, যে ঘর বানিয়েছে।

এ আয়াতেও ওলী মাবুদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এ আয়াতে কাফিরদের নিন্দা করা হচ্ছে এবং ওরাই অন্যদেরকে মাবুদ হিসেবে বিশ্বাস করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহর ওলী ও আল্লাহর প্রতিদ্বন্দী ওলী

দোস্ত বা সাহায্যকারী অর্থবোধক ওলী দু'রকমের হয়ে থাকে- এক, আল্লাহর ওলী, দুই, আল্লাহর প্রতিদ্ধন্দী ওলী। তিনিই আল্লাহর ওলী, যিনি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখেন এবং আল্লাহর বন্ধু। এ কারণে বিশ্ববাসী আল্লাহর ওলীগণকে ভালবাসেন। আল্লাহর প্রতিদ্বন্দী ওলী দু'রকমের হয়ে থাকে– এক, আল্লাহর দুশমন-কাফির, মূর্তি বা শয়তানকে বন্ধু সাব্যস্ত করা। দুই, আল্লাহর বন্ধুগণকে যথা নবী ওলীগণকে আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী মনে করা। অর্থাৎ এ ধারণা পোষন করা যে ওনারা আল্লাহর মুকাবিলায় আমাদের কাজে আসবে। আল্লাহর ওলীগণকে মান্য করা যথার্থ ঈমানের পরিচায়ক আর আল্লাহর প্রতিদ্বন্দী ওলী হিসেবে কাউকে গ্রহণ করা অকাট্য কুফরী ও শিরক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ– اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ–

জেনে রেখ, আল্লাহর ওলীগণের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাযুক্ত হবেন না। তাঁরা হচ্ছেন, যাঁরা ঈমান এনেছেন এবং পরহিজগারী করেন।

এ আয়াতে আল্লাহর ওলীর কথা বর্ণিত হয়েছে।

(২) لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

মুসলমানগন মুসলমান ব্যতীত কাফিরদেরকে যেন বন্ধু না বানায়।

(৩) وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَانَصِيْرٍ

আল্লাহর মুকাবিলায়, না তোমাদের কোন বন্ধু আছে,না সাহায্যকারী।

এ দু'আয়াতে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ওলীর কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে খোদার দুশমনদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন না করার জন্য বলা হয়েছে, দ্বিতীত আয়াতে আল্লাহর মুকাবিলায় কোন বন্দুর অস্থিত্বের কথা অস্বীকার করা হয়েছে।অর্থাৎ আল্লাহর মুকাবিলায় দুনিয়াতে কোন সাহায্যকারী ওলী,পীর ও নবী নেই। ওনারা যা সাহায্য করেন, তা আল্লাহর হুকুমে ও ইচ্ছায় করেন।

ওলী বা আওলীয়ার উপরোক্ত অর্থের প্রতি খুবই সজাগ থাকা প্রয়োজন। কেননা অসংলগ্ন অর্থের দ্বারা বদ আকীদার মনোভাব গড়ে উঠে। যেমন ১নং আয়াতে اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ الاية এর অর্থ যদি এ রকম করা হয়---"তোমাদের মাবুদ হলেন আলাহ,তার রসূল ও মুমিনগন"–তাহলে শিরক হয়ে গেল। مَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ

اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَانَصِيْرٍ। এর অর্থ যদি এরকম করা হয় "আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী নেই" তাহলে কাফির হয়ে গেল।কেননা কুরআনে অনেক সাহায্যকারীর কথা বর্ণিত হয়েছে।আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান কাফির ও অভিশপ্তদের কোন সাহায্যকারী নেই।এতে বুঝা গেল যে,মুমিনদের সাহায্যকারী আছে।

(১) وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا

যার প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেন, ওর জন্য কোন সাহায্যকারী পাওয়া যাবে না।

(২) وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ

যাকে আল্লাহ গুমরাহ করে দেন,ওর পিছনে কোন সাহায্যকারী নেই।

(৩) وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

যাকে আল্লাহ গুমরাহ করে দেন,ওর জন্য আপনি কোন পথ প্রদর্শক মুরশিদ পাবেন না।

دعا–দুআ

دعا (দুআ) শব্দটি دَعْوٌ বা دَعْوَتٌ থেকে গঠন করা হয়েছে, যার অর্থ আহবান করা বা চিৎকার করে ডাকা। دعا (দুআ) শব্দটি কুরআন শরীফে পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা- (১) ডাকা, (২) আহবান করা, (৩) প্রার্থনা করা, বা দুআ করা, (৪) পূজা করা অর্থাৎ মাবুদ মনে করে ডাকা, (৫) আশা-আকাংখা করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

(১) اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۤئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ

ওদেরকে ওদের বাপের সূত্র ধরে ডেকো। ইহাই আল্লাহর কাছে ন্যায় সঙ্গত।

(২) وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْۤ اُخْرٰىكُمْ

রসূল তোমাদেরকে তোমাদের পিছন হতে ডাকতেন।

(৩) لَاتَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

রসূলের ডাকাকে একে অন্যকে ডাকার মত গণ্য করিও না।

এ সব আয়াতে دعا (দুআ) অর্থ চিৎকার করে ডাকা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

আপনার প্রভূর পথে লোকদেরকে হেকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহবান করুন।

(২) وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে ডেকো।

(৩) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ

তোমাদের মধ্যে এক দল এ রকম হওয়া চায়, যারা ভালোর দিকে আহবান করে।

এ ধরণের আয়াতে دعا (দুআ) অর্থ আহবান করা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

(১) اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

তোমাদের প্রভূর কাছে বিনয়ের সাথে গোপনীয় ভাবে দুআ প্রার্থনা কর।

(২) اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ

নিশ্চয় আমার প্রভূ দুআ শ্রবনকারী।

(৩) رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

হে আমাদের প্রভূ, আমার দুআ কবুল করুন।

(৪) فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

যখন তারা নৌকায় আরোহন করে তখন আল্লাহর দীনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে তাঁর কাছে দুআ প্রার্থনা করে।

(৫) وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا–

হে আমার প্রভূ! আমি তোমার কাছে দুআ প্রার্থনা করে কখনো বিফল হইনি।

(৬) اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

আমি দুআ প্রার্থনাকারীদের দুআ কবুল করি, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে।

(৭) وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ

কাফিরদের দুআ গোমরাহীতে নিমজ্জিত করা ছাড়া আর কিছু নয়।

(৮) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ

তথায় যকরীয়া স্বীয় প্রভূর কাছে দুআ প্রার্থনা করেন।

এ সব আয়াতে دعا (দুআ) অর্থ দুআ প্রার্থনা করা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ

তোমাদের জন্য জান্নাতে সেটাই হবে, যেটা তোমাদের মন চায় এবং তোমাদের জন্য সেখানে সেটাই হবে, যেটা তোমরা কামনা কর।

এ আয়াতে دعا (দুআ) কামনা-বাসনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

(১) اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ

আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের পূজা কর, তারা তোমাদের মত বান্দা।

(২) وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَاتَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর । তাই আল্লাহর সাথে অন্য কারো পূজা কর না।

(৩) وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ–

ওর থেকে বড় গোমরাহ কে আছে, যে আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর পূজা করে, যেটা কিয়ামত পর্যন্ত ওর পূজা কবুল করবে না।

(৪) قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ تَكُنْ تَدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا

কাফিরেরা বলবে, আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বরং আমরা এর আগে কোন কিছুর পূজা করতাম না।

(৫) وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَايَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ

আল্লাহকে বাদ দিয়া যাদের এ মুশরিকরা পূজা করে, ওগুলো কোন কিছু

pdf By Syed Mostafa Sakib

সৃষ্টি করে না বরং ও গুলো সৃষ্ট, ওগুলো মৃত,জীবিত নয়।

(৬) وَاِذَا رَاٰ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ –

মুশরিকরা যখন তাদের মাবুদগুলোকে দেখবে, তখন বলবে- হে আমাদের প্রভূ, এগুলো আমাদের সেই মাবুদ,যেগুলোকে আমরা তোমাকে বাদ দিয়ে পূজা করতাম।

এ রকম ওসমস্ত আয়াত, যে গুলোতে গায়রুল্লাহকে আহবান শিরক বা কুফরী বলা হয়েছে,বা এর জন্য ধমক দেয়া হয়েছে, সে সব আয়াতে دعا (দুআ) পূজা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং يدعون এর অর্থ হচ্ছে-ওরা পূজা করে। এর ব্যাখ্যা কুরআনের সেই আয়াত সমুহে করা হয়েছে, যেসব আয়াতে دعا শব্দের সাথে عبادت বা اِلٰه শব্দ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

(১) هُوَ الْحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ– قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

তিনিই চির জীবিত, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তারই ইবাদত কর মনে প্রাণে। সব সৌন্দর্য আল্লাহর জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রভূ। আপনি বলে দিন, আমাকে বারণ করা হয়েছে ওসবের পূজা করা থেকে, যেগুলোকে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে পূজা কর।

এ আয়াতে لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ এবং اَنْ اَعْبُدَ দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে এখানে دعا অর্থ পূজা করা বুঝানো হয়েছে, ডাকা বুঝানো হয়নি।

(২) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

তোমাদের প্রভূ বলেছেন-আমার কাছে দুআ প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের দুআ কবুল করবো। নিশ্চয় যে আমার ইবাদতের ব্যাপারে অহংকার করে, সে শীঘ্রই অপদস্থ হয়ে দোযখে যাবে।

এখানে دُعا দ্বারা দুআ প্রার্থনা বুঝানো হয়েছে এবং দুআ প্রার্থনা যেহেতু একপ্রকার ইবাদত, সে জন্য সাথে সাথে ইবাদতের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

(৩) وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ – وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ–

ওর থেকে বড় গোমরাহ কে আছে, যে খোদাকে বাদ দিয়ে সেটার পূজা করে, যেটা কেয়ামত পর্যন্ত ওর কথা শুনবে না এবং যখন মানুষের হাশর হবে তখন এ দেবতাগুলো ওদের দুশমন হবে এবং ওদের ইবাদতের অস্বীকারকারী হয়ে যাবে।

এখানেও دعا অর্থ ডাকা নয় বরং পূজা করা অর্থাৎ মাবুদ মনে করে ডাকা বুঝানো হয়েছে। কেননা এর পরপরই ওদের এ কাজকে ইবাদত বলা হয়েছে। এ আয়াতগুলো ও সমস্ত আয়াত গুলোর ব্যাখ্যা, যে গুলোতে গায়রুল্লাহকে ডাকা শিরক বলা হয়েছে। যদি খোদা ভিন্ন অন্য যে কাউকে ডাকা শিরক হতো, তাহলে যে সব আয়াতে ডাকার হুকুম দেয়া হয়েছে, সে সব আয়াতের সাথে দ্বন্দ্ব হয়ে যেত। ডাকা সম্পর্কিত আয়াত আমি একটু আগে পেশ করেছি। তফসীরকারকগণ ওসব নিষেধাজ্ঞার আয়াত সমূহে دعا শব্দের অর্থ করেন– ইবাদত। তাঁরা কুরআনের উপরোক্ত আয়াত সমূহের আলোকে এ ব্যাখ্যা করে থাকেন।

আপত্তি নং-১ ঃ কোন অভিধানে دعا শব্দের অর্থ ইবাদত উল্লেখিত নেই। প্রায় অভিধানে দুআর অর্থ করা হয়েছে- আহবান করা, ডাকা। সুতরাং ওসব আয়াতে দুআর অর্থ ডাকাই হবে। (জাওয়াহেরুল কুরআন)

জবাব ঃ এর দুটি উত্তর রয়েছে। এক, দুআর আভিধানিক অর্থ ডাকা এবং পারিভাষিক অর্থ ইবাদত। কুরআন মজিদে এ শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে আয়াতে ডাকার অনুমতি আছে, ওখানে দুআর আভিধানিক অর্থ বুঝানো হয়েছে এবং যে আয়াতে খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে ডাকার নিষেধাজ্ঞা আছে, সেখানে দুআর প্রচলিত অর্থ অর্থাৎ পূজা বুঝানো হয়েছে। যেমন অভিধানে সালাত অর্থ দুআ এবং প্রচলিত অর্থ নামায। কুরআনে اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ বাক্যাংশে সালাত দ্বারা নামায বুঝানো হয়েছে এবং صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ও صَلِّ عَلَيْهِمْ বাক্যদ্বয়ে সালাত শব্দটি দুআ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ওদের আপত্তিটা এ রকম, যেমন- কেউ নামায অস্বীকার করে বললো কুরআনের কোথাও নামাযের কথা উল্লেখিত নেই। যেখানে সালাতের কথা বর্ণিত আছে, সেখানে দুআই বুঝানো হয়েছে। কেননা সালাতের আভিধানিক অর্থ দুআ। অনুরূপ তাওয়াফের আভিধানিক অর্থ চারিদিকে ঘুরা আর পারিভাষিক অর্থ একটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ ইবাদত । কুরআনে এ শব্দ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দুই, এটা ঠিক যে দুআর প্রকৃত অর্থ ডাকা, কিন্তু ডাকার মধ্যে অনেক রকম ফের আছে। যার মধ্যে একটি হচ্ছে কাউকে খোদা মনে করে ডাকা, যেটা ইবাদত হিসেবে গণ্য। নিষেধাজ্ঞার আয়াত সমূহে এ অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে যেন খোদা মনে করে না ডাকে। এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে করে দেয়া হয়েছে।

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ

যে খোদার সাথে অন্য কাউকে ডাকে, যার কোন প্রমাণ ওর কাছে নেই, ওর হিসেব আল্লাহর কাছে আছে।

এ আয়াত খুব পরিষ্কার করে বলে দিল যে ডাকার দ্বারা আল্লাহ মনে করে ডাকা বুঝানো হয়েছে।

আপত্তি নং-২ ঃ ওসব নিষেধাজ্ঞার আয়াত সমূহে دعا শব্দ দ্বারা ডাকাই বুঝানো হয়েছে। কাউকে দূর থেকে এ মনে করে ডাকা যে সে ওর ডাক শুনছে, এটা শিরক। (জাওয়াহেরুল কুরআন)

জবাব ঃ এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্তধারণা। কুরআনের ওসব আয়াতে দূর-নিকটের কোন কথা উল্লেখ নেই। এ শর্তারোপ ওরা মনগড়া আরোপ করেছে। তাছাড়া এ শর্ত স্বয়ং কুরআনের নিজস্ব ব্যাখ্যারও বিপরীত। সুতরাং এ ধরণের আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। দূর থেকে ডাকা যদি শিরক হয়, তাহলে সবাই মুশরিক হয়ে যাবে। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহ আনহু) মদীনা মনোয়ারা থেকে হযরত সারিয়া (রাদি আল্লাহ আনহু) কে ডাক দিয়েছিলেন, অথচ তিনি তখন ছিলেন সুদূর নিহাওন্দে। হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) কাবা শরীফ তৈরী করে দূরের সমস্ত লোককে ডেকে ছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী সমস্ত মানুষের রূহ এ আওয়াজ শুনে ছিল, যার বর্ণনা কুরআন মজীদে উল্লেখিত আছে। প্রত্যেক নামাযী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দূর থেকে ডাকে- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (হে নবী আপনার প্রতি সালাম)। যদি এটা শিরক হয়ে যায়, তাহলে নামাযীর নামায শেষ হবার আগে ঈমান শেষ হয়ে যাবে। আজকাল রেডিও, টিভির মাধ্যমে দূর থেকে লোকদেরকে সম্বোধন করে বক্তৃতা বিবৃতি দেয়া হয় এবং লোকেরা তা শুনে। যদি বলা হয় যে রেডিও বা টিভির এ আহবান বিদ্যুত শক্তির মাধ্যমে শুনানো হয় এবং কোন মাধ্যমের সাহায্যে দূর থেকে শুনা শিরক নয়, তাহলে আমরাও বলবো যে নাবুয়াতের নূরের শক্তি একটি মাধ্যম এবং এ মাধ্যমের

অধীনে শুনা শিরক নয়। এ আপত্তিটা একেবারে ভিত্তিহীন।

আপত্তি নং ৩ ঃ নিষেধাজ্ঞার আয়াতসমূহে মৃতদেরকে ডাকা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৃতদেরকে এ মনে করে ডাকা যে ওরা সে ডাক শুনে, এটা শিরক। (জাওয়াহেরুল কুরআন)

জবাব ঃ কয়েকটি কারণে এ আপত্তিটাও বাজে। একেতঃ মৃতের শর্তারোপটা ওদের মনগড়া। কুরআনে এ রকম বর্ণিত নেই। আল্লাহ তাআলা মৃত-জীবিত উপস্থিত-অনুপস্থিত দূর-নিকটের শর্তারোপ করে নিষেধ করেননি। সুতরাং এ শর্ত বাতিল। দ্বিতীয়তঃ এ ব্যাখ্যা স্বয়ং কুরআনের ব্যাখ্যার বিপরীত। কুরআনে دعا ইবাদত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয়তঃ যদি মৃতদেরকে ডাকা শিরক হয়, তাহলেতো প্রতিটি নামাযী মুশরিক হয়ে যাবে। কেননা প্রত্যেক নামাযী নামাযে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে এ বলে ডাকে - اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (হে নবী আপনার প্রতি সালাম) আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন কবরস্থানে এ ভাবে সালাম পেশ করে- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (হে মুসলিম পরিবারের লোকেরা, তোমাদের প্রতি সালাম) হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) জবেহকৃত পাখীগুলোকে ডাক দিয়েছিলেন। পাখী গুলো সে ডাক শুনে ছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا অতপর সেই মৃত পাখী গুলোকে ডাক দাও, সে গুলো তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে।

হযরত সালেহ (আলাইহিস সালাম) ও হযরত শোয়ায়েব (আলাইহিস সালাম) তাঁদের কউমকে ধ্বংসের পর ডেকে ছিলেন। হযরত সালেহ (আলাইহিস সালামের) এর কাহিনী সূরা আরাফে এ ভাবে বর্ণিত আছে-

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ-

তখন তাদেরকে ভুমিকম্পে পেয়েছিল, তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছিল। তখন সালেহ (আলাইহিস সালাম) ওদের থেকে মুখ ফেরায়ে নিলেন এবং বললেন, হে আমার কউম! নিশ্চয় আমি আমার মওলার বাণী তোমাদের নিকটে পৌঁছেয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল চেয়েছি। কিন্তু তোমরা শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে পছন্দ করতে না।

শোয়ায়েব (আলাইহিস সালাম) এর কাহিনীও সেই সূরা আরাফে একটু আগে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ-

শোয়াইব (আলাইহিস সালাম) কাফিরদের ধ্বংসের পর ওদের থেকে মুখ ফেরায়ে নিলেন এবং বললেন- হে আমার কউম, আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভূর পয়গাম পৌঁছায়ে দিয়েছি, তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। তাই আমি কাফির কউমের জন্য কি করে শোক প্রকাশ করবো?

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে فَتَوَلّٰى এর ف বর্ণ দ্বারা (আরবী ব্যাকরণ অনুসারে) বুঝা গেল যে পয়গাম্বরদ্বয়ের এ সম্বোধন তাঁদের কউমের ধ্বংসের পর করা হয়েছিল স্বয়ং আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বদর যুদ্ধের দিন নিহত আবু জেহেল, আবু লাহাব, উমাইয়া ইবনে খলফ ও অন্যান্য কাফিরদেরকে ডাক দিয়ে ওদের পরিনতির কথা বলেছিলেন। হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহ আনহু) এ ডাকের রহস্য জানতে চাইলে, তিনি বলেন, তোমরা এ সব মৃতদের থেকে বেশী শুননা।

বলুন, যদি কুরআনের ফত্ওয়া দ্বারা মৃতদেরকে ডাকা শিরক হয়, তাহলে এ নবীগণের ডাকার কি জবাব দেবে? মোট কথা এ আপত্তি নিছক বাতিল।

আপত্তি নং- ৪ ঃ কাউকে হাজত পূর্ণ করার জন্য দূর থেকে ডাকা শিরক এবং নিষেধাজ্ঞার আয়াতসমূহে এটাই বুঝানো হয়েছে। অতএব নবী-ওলীকে হাজত পূর্ণকারী মনে করে দূর থেকে ডাকা শিরক। (জাওয়াহেরুল কুরআন)

জবাব ঃ এ আপত্তিটাও ভুল। প্রথমতঃ এ কারণে যে, কুরআনের নিষেধাজ্ঞার আয়াতসমূহে এ শর্তারোপ করা হয়নি। এটা ওদের মনগড়া শর্ত। তাই এটা গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত: এ ব্যাখ্যা স্বয়ং কুরআনী ব্যাখ্যার বিপরীত। যেমন আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। তৃতীয়তঃ আমি প্রমাণ সহকারে উল্লেখ করেছি যে আল্লাহর প্রিয় বান্দা গণ নূরে নাবুয়াতের মাধ্যমে হোক বা নূরে বেলায়তের মাধ্যমে দূর থেকে শুনেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দেখাবো যে আল্লাহর বান্দাগণ হাজত পূর্ণকারী এবং মুশকিল আসানকারীও। যখন এ দুটি বিষয় পৃথক পৃথক ভাবে সঠিক প্রমানিত হয়, তাহলে এ গুলোর সমষ্টি কি করে শিরক হতে পারে। কুরআন বলছে, আল্লাহর বান্দা মৃত্যুর পরে শুনে এবং জবাবও দেয়, যা বিশেষ ব্যক্তিগণ অনুভব করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ-

হে হাবীব, ওসব রসূলগণকে জিজ্ঞেস করুন, যাদেরকে আমি আপনার আগে প্রেরণ করেছি - আমি কি খোদা ব্যতীত এমন মাবুদ তৈরী করেছি, যার ইবাদত করা যায়?

লক্ষ্য করুন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সালাম) এর যুগে পূর্ববর্তী নবীগণ ওফাত প্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, হে মাহবুব, ওসব ওফাত প্রাপ্ত রসূলগণকে জিজ্ঞেস করুন, খোদা ছাড়া অন্য কোন মাবুদ আছে কি না। জিজ্ঞাসা ওকেই করা হয়, যে শুনে এবং জবাবও দেয়। এতে বুঝা গেল আল্লাহর বান্দাগণ ওফাতের পর শুনেন ও কথা বলেন। মেরাজের রাতে সমস্ত ওফাতপ্রাপ্ত রসূলগণ হুযূরের পিছনে নামায পড়ে ছিলেন। বিদায় হজ্জের সময় ওফাতপ্রাপ্ত রসূলগণ হজ্বে অংশ গ্রহণ করেন এবং হজ্ব আদায় করেন। এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীছ মওজুদ রয়েছে।

সারকথা হলো دعا শব্দটি কুরআন করীমে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে যে অর্থ প্রযোজ্য সেখানে সে অর্থ করা চায়। সে সব ওহাবীরা প্রত্যেক জায়গায় دعا এর অর্থ- ডাকা করেছে। সেটা এমন মারাত্মক ভুল যে এর ফলে কুরআনী উদ্দেশ্য শুধু ব্যাহত নয় বরং বিকৃত হয়ে যায়। যে জন্য ওহাবীদের সেই ডাকা অর্থের সাথে অনেক শর্তারোপ করতে হয়েছে। কোন সময় বলেছে যে دعا অর্থ অদৃশ্যকে ডাকা, কোন সময় বলেছে মৃতকে ডাকা, কোন সময় বলেছে দূর থেকে শুনানোর জন্য ডাকা, আবার কোন সময় বলেছে মাধ্যম বিহীন শুনানোর জন্য দূর থেকে ডাকা শিরক। আশ্চর্যের বিষয়, কাউকে ডাকাটা যদি ইবাদত হয়ে থাকে, তাহলে জীবিত, মৃত, দূর-নিকট যে কারো ইবাদত করা হোক না কেন, শিরক হিসেবে গন্য হবে। এতে এ সব শর্ত অর্থহীন। মোট কথা এ অর্থ একেবারে ভুল। যে সব জায়গায় دعا অর্থ পূজা বুঝায়, সেখানে কোন শর্তের প্রয়োজন হয় না। কোন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা নেই।

বিঃ দ্রঃ আল্লাহর প্রিয় পাত্রগণ ওফাতের পরও জীবিতদের সাহায্য করেন। এ কথাটি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ-

স্মরন কর, যখন আল্লাহ তাআলা পয়গাম্বরগণ থেকে এ মর্মে ওয়াদা নিলেন যে আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হেকমত দান করবো, অতঃপর তোমাদের কাছে সেই রসূল তশরীফ আনবেন, যিনি তোমাদের কিতাব সমূহের সত্যায়ন

pdf By Syed Mostafa Sakib

করবেন, তখন তোমরা যেন ওনার উপর ঈমান আন এবং ওনার সাহায্য কর।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, মিছাকের দিন আল্লাহ তাআলা নবীগণ থেকে দুটি ওয়াদা নিয়েছেন। এক, হুযূরের উপর ঈমান আনা। দুই, হুযূরের সাহায্য করা। আল্লাহ তাআলা জানতেন যে, শেষ নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওসব নবীগণের কারো জীবিতবস্থায় তশরীফ আনবেন না। এরপরও ওনাদেরকে ঈমান আনার ও সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। বুঝা গেল যে এর দ্বারা রূহানী ঈমান ও রূহানী সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। নবীগণ ওয়াদাদ্বয় যথাযথ পালন করেছেন। মেরাজের রাতে সবাই হুযূরের পিছনে নামায পড়েছেন। এটা ঈমানের প্রমাণ। অনেক নবী বিদায় হজ্বে অংশ গ্রহণ করেছেন। হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম) মেরাজ রজনীতে দীনে মুস্তাফার সাহায্য করেছেন। তাঁর পরামর্শে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায কমায়ে পাঁচ ওয়াক্ত করায়েছেন। ওসব নবীগণ মুসলমানদের ও ইসলামের রূহানী সাহায্য করছেন। যদি এ সাহায্য পাওয়া না যেত, তাহলে সেই ওয়াদা অর্থহীন হতো। হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) শেষ যুগে সেই ওয়াদাকে প্রকাশ্য ভাবে পালন করার জন্য স্বশরীরে তশরীফ আনবেন।

عبادت– ইবাদত

কুরআন শরীফের পরিভাষাসমূহের মধ্যে ইবাদতও একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম পরিভাষা। কেননা এ শব্দটা কুরআন শরীফে অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থে খুবই সূক্ষ্মতা রয়েছে। আনুগত্য, তাজীম ও ইবাদত-এ তিন শব্দের মধ্যে একান্ত সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে। অনেকেই এ সূক্ষ্ম পার্থক্যকে গুরুত্ব দেয় না। প্রত্যেক তাজীমকে বরং প্রত্যেক ইবাদতকে ইবাদত সাব্যস্ত করে সমগ্র মুসলমান এমন কি নিজেদের বুজুর্গগণকেও মুশরিক ও কাফির বলে ফেলে। ইবাদতের অর্থ ও এর উদ্দেশ্য খুবই মনোযোগ সহকারে শুনুন।

ইবাদত 'আবদুন' শব্দ থেকে গঠন করা হয়েছে। আবদুন অর্থ বান্দা। ইবাদতের শাব্দিক অর্থ বান্দা হওয়া বা স্বীয় বন্দেগী প্রকাশ করা, যদ্বারা খোদার খোদায়িত্ব স্বীকার করাটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তফসীরকারকগণ ইবাদতের অর্থ একান্ত তাজীম ও একান্ত বিনয়ও করেছেন। উভয় অর্থ সঠিক। কেননা ইবাদতকারীর চূড়ান্ত বিনয়ের দ্বারা মাবুদের চূড়ান্ত তাজীম অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং মাবুদের প্রতি চূড়ান্ত তাজিম থেকে ইবাদতকারীর চূড়ান্ত বিনয় প্রকাশ পায়। চূড়ান্ত তাজীমের সীমা হলো মাবুদের প্রতি সেই পরিমান তাজীম করা, যার অধিক সম্ভব নয় এবং স্বীয় বিনয় এতটুকু প্রকাশ করা, যার নীচু আর কোন স্তর নেই।

ইবাদতের শর্ত ঃ ইবাদতের শর্ত হচ্ছে ইবাদতকারী কাউকে ইলাহ এবং নিজেকে সেই ইলাহের বান্দা মনে করা। এ ধারণা নিয়ে সেই ইলাহের যে তাজিমই করা হবে, সেটা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। যদি কাউকে ইলাহ মনে করা না হয়, বরং নবী, ওলী, বাপ, উস্তাদ, পীর, বিচারক, বাদশা ইত্যাদি মনে করে তাজীম করা হয়, সেটা আনুগত্য, তাজিম, সম্মান ইত্যাদি হবে কিন্তু ইবাদত হিসেবে গন্য হবে না। উল্লেখ্য যে আনুগত্য ও তাজীম আল্লাহ ও বান্দা সবের হতে পারে। কিন্তু ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই, বান্দার জন্য হতে পারে না। যদি বান্দার ইবাদত করা হয়, তাহলে শিরক হয়ে গেল। আর বান্দার তাজীমের ব্যাপারে, যে রকম বান্দা, সে রকম হুকুম। কোন কোন তাজীম কুফর, যেমন গংগা, যমুনা হুলি দিওয়ালী ইত্যাদির তাজীম, কোন কোন তাজীম ঈমানেরই অংশ, যেমন, পয়গম্বরের তাজীম, আবার কোন তাজীম পূণ্যময় এবং কোন তাজীম গুনাহ্। এ জন্য কুরআন করীমে ইবাদতের সাথে আল্লাহ বা রব বা ইলাহের উল্লেখ আছে আর আনুগত্য ও তাজীমের সাথে আল্লাহর কথাও উল্লেখ আছে এবং নবী, ওলী, মা-বাপ, বিচারক ইত্যাদির কথাও উল্লেখ আছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমানঃ

(১) وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَّاتَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

আপনার প্রভূ ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত কর না এবং মা-বাপের প্রতি ইহসান কর।

(২) مَاقُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ

ওদেরকে আমি অন্য কিছু বলিনি কিন্তু সেটাই যেটার ব্যাপারে তুমি আমাকে নির্দেশ দিয়েছ-আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি তোমাদের ও আমার প্রভূ।

(৩) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ

হে জনগণ, নিজেদের সেই প্রভূর ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

(৪) نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ

আমরা আপনার ইলাহ ও আপনার পিতা ও পিতামহ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাক (আলাইহিমুস সালাম) এর ইলাহের ইবাদত করবো।

(৫) قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَآ اَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ

বলে দিন, হে কাফিরেরা, তোমরা যাদের পূজা কর, আমরা ওদের পূজা করি না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ রকম সমস্ত ইবাদতের আয়াতে কেবল আল্লাহর কথা উল্লেখিত আছে কিন্তু আনুগত্য ও তাজীম সম্পর্কিত আয়াতে সবের কথা বর্ণিত আছে। যেমন–

(১) أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রসূলের ও তোমাদের মধ্যে যারা হুকুম দাতা।

(২) وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ

যে রসূলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।

(৩) وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ

নবীর সাহায্য কর এবং তাঁর তাজীম কর।

(৪) فَالَّذِيْنَ أٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ

অতপর, যারা নবীর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর তাজীম করেছে এবং তাঁকে সাহায্য করেছে।

(৫) وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

যে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের তাজীম করে, সেটা আন্তরিক পরহিযগারীর পরিচায়ক।

মোট কথা তাজীম ও আনুগত্য বান্দারও হতে পারে কিন্তু ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস। তবে ইবাদতের মধ্যে এ শর্তারোপ করা হয়েছে যে ইলাহ মনে করে কারো তাজীম করা। সাথে সাথে এটাও জেনে রাখা দরকার যে ইলাহ কে? এর পরিপূর্ণ বিশ্লেষন আমি ইলাহের আলোচনায় করেছি যে ইলাহ হচ্ছে সে, যাকে সৃষ্টিকর্তা বলে মান্য করা হয় বা সৃষ্টিকর্তার সমতুল্য মনে করা হয়। সমতুল্যটা হয়তো খোদার সন্তান মনে করে হোক, বা খোদার মত স্বতন্ত্র মালিক, হাকিম, চিরজীবি ও চিরস্থায়ী মনে করে হোক বা আল্লাহ তাআলাকে ওটার মুখাপেক্ষী মনে করে হোক। একই কাজ সেই আকীদা অনুসারে হলে ইবাদত অন্যথায় ইবাদত নয়। দেখুন, আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাগণকে নির্দেশ দিলেন- আদম (আলাইহিস সালাম) কে সিজদা কর। যেমন–

(১) فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ

অতঃপর যখন আমি ওনাকে যথাযথ ভাবে তৈরী করে ওনার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিব, তোমরা ওনার সম্মানে সিজদায় পতিত হও।

(২) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর উঠায়ে নিলেন, এবং তাঁরা সবাই তাঁর সামনে সিজদায় পতিত হলেন।

এ আয়াতদ্বয় থেকে যথাক্রমে জানা গেল যে ফিরিশতাগণ আদম (আলাইহিস সালাম) কে সিজদা করেছেন এবং ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর ভাইগণ ওনাকে সিজদা করেছেন। অন্যান্য উম্মতদের মধ্যেও সিজদার প্রচলন ছিল, ছোটরা বড়দেরকে সিজদা করতো। আবার কুরআনে এ রকম আয়াতও রয়েছে–

لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ

চাঁদ সূর্যকে সিজদা কর না। সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি ওগুলো সৃষ্টি করেছেন।

এ ধরণের অনেক আয়াতে সিজদা নিষেধ করা হয়েছে বরং কুফরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই উভয় প্রকারের আয়াত সমূহের মধ্যে এ ভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যে আগের আয়াতদ্বয়ে তাজিমী সিজদা বুঝানো হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতে সিজদায়ে ইবাদতী বুঝানো হয়েছে। বান্দাদের জন্য সিজাদায়ে ইবাদত কোন সময় জায়েয ছিল না, সব সময়ের জন্য এটা শিরক হিসেবে বিবেচ্য। অবশ্য আগের দিনগুলোতে তাজীমী সিজদা জায়েয ছিল। কিন্তু আমাদের ইসলামে সেটা হারামএবং সিজদায়ে ইবাদতী শিরক। একই কাজ খোদায়িত্বের বিশ্বাস নিয়ে করলে শিরক, অন্যথায় শিরক নয়। মুসলমানগণ হাজরে আসওয়াদ, মকামে ইব্রাহীম ও জমজমের পানির তাজীম করার দ্বারা মুশরিক নয়। কিন্তু হিন্দুরা মূর্তি ও গংগার পানির তাজীম করার দ্বারা মুশরিক। কেননা মুসলমানদের মনে ওসব জিনিষের মধ্যে খোদায়িত্বের ধারণা নেই কিন্তু কাফিরদের মনে খোদায়িত্বের বিশ্বাস রয়েছে।

ইবাদতের প্রকারভেদ

ইবাদত অনেক রকম আছে-জানী, আর্থিক দৈহিক, সাময়িক ইত্যাদি। কিন্তু মূলতঃ ইবাদত দু'-প্রকার। এক, যার সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সাথে। যেমন- নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি। এ সব কাজে কেবল আল্লাহ তাআলার রেজামন্দীর নিয়ত করা হয়। এ সব কাজে বান্দার সন্তুষ্টির কোন স্থান নেই। দুই, যার সম্পর্ক বান্দার সাথেও এবং আল্লাহ তাআলার সাথেও। অর্থাৎ যেসব বান্দাদের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহর রেজামন্দীর জন্য ওনাদের আনুগত্য করা আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য। যেমন- পিতা-মাতার আনুগত্য, মুরশিদ ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দরূদ, প্রতিবেশীর হক আদায়। মোট কথা যে কোন বৈধ কাজ যদি সে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়, তাহলে আল্লাহর ইবাদত হয়ে যায় এবং এর জন্য ছওয়াব অর্জিত হয়। এমন কি যারা স্ত্রী-সন্তানকে উপার্জন করে এ নিয়তে খাওয়ায় যে এটা রসূলের সুন্নাত এবং এতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, তাদের উপার্জনটাও ইবাদত। যারা আল্লাহর রিযিক এ নিয়তে গ্রহণ করে যে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন- كُلُوْا وَاشْرَبُوْا (খাও ও পান কর) এবং এটা নবীর সুন্নাত ও ফরজ আদায় করার সহায়ক, তাদের খাওয়াটাও ইবাদত। এ জন্য আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের পানাহার, শোয়া-জাগা সবই ইবাদত। এমন কি ওনাদের অশ্ব পরিচালনাও ইবাদত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا- فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا

ওসব ঘোড়াগুলোর কসম, যে গুলো দৌড়াবার সময় বুকের আওয়াজ বের হয়। অতঃপর পদাঘাত করে পাথর থেকে আগুন বের করে। তারপর ভোর হতেই কাফিরদের সিংহাসন উলট-পালট করে দেয়।

অতএব পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করা ও তাদের আনুগত্য করাও আল্লাহর ইবাদত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জন্য জান মাল কুরবান করা হচ্ছে তাঁর আনুগত্য এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত বরং সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত। বর্তমান যুগের ওহাবীরা সেই খোদায়িত্বের শর্ত সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর তাজীম ও সম্মানকে শিরক বলে ফেলে। ওদের মতে মিলাদ মাহফিল শিরক, মাযারে যাওয়া শিরক, ঈদের দিন উন্নত খাবার পরিবেশন শিরক যেন প্রতিটি কদমে শিরক। এরা মুশরিক ও কাফিরদের সম্পর্কিত আয়াত সমূহ মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কুফরীর ডংকা বাজাচ্ছে।

আপত্তি নং- ১ ঃ কাউকে হাজত পূর্নকারী বা মুশকিল আসানকারী মনে করে তাজীম করা ইবাদত এবং কারো সামনে মাথানত করা বন্দেগী। (জাওয়াহেরুল কুরআন, তকরিয়াতুল ঈমান)

জবাব ঃ এটা ভুল ধারণা। আমরা সমসাময়িক শাসকদের এ মনে করে তাজীম করি যে অনেক বিপদ আপদে ওনাদের কাছে যেতে হয়। এটা কখনো ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। বিচারক ও শিক্ষকের তাজীম এ জন্য করা হয় যে ওনাদের দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। এটা ইবাদত নয়।

আপত্তি নং- ২ ঃ কাউকে মাধ্যমবিহীন হস্তক্ষেপকারী মনে করে ওর তাজীম করা ইবাদত এবং এটা শিরক।

জবাব ঃ এটাও ভ্রান্ত ধারণা। ফিরিশতাগণ কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে হস্তক্ষেপ করে থাকেন। তাঁরা প্রান হরন করেন, মায়ের পেটে সন্তান তৈরী করেন, বৃষ্টি বর্ষন করেন,

আল্লাহর আযাব নিয়ে আসেন। এ ধারণায় ওনাদের তাজীম করা কি ইবাদত? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর অনুমতিতে আঙুল হতে পানির ঝর্না প্রবাহিত করেছেন, চাঁদ দু'টুকরা করেছেন, ডুবন্ত সূর্যকে ফিরায়ে এনেছেন, কংকর ও পাথরের দ্বারা কলেমা পড়ায়েছেন, বৃক্ষরাজি ও পশুকূল দ্বারা তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করায়েছেন। হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর অনুমতিতে মৃতকে জীবিত করেছেন, অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীদেরকে আরোগ্য করেছেন। এ সব কাজ মাধ্যমবিহীন করা হয়েছে। তাই বলে কি ওনাদের প্রতি তাজীম ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে? কক্ষনো নয়, কেননা কেউ ওনাদেরকে খোদার সমতুল্য মনে করে না। খোদার সমতুল্য মনে করাটাই ইবাদতের জন্য প্রথম শর্ত। ওনারা সবাই আল্লাহর বান্দা এবং যা কিছু করেন, সবই আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছায় করেন। এ জন্য হযরত সালেহ, হযরত হুদ, হযরত শোয়ায়েব, হযরত নূহ ও অন্যান্য সমস্ত নবীগণ নিজ নিজ কউমকে সর্ব প্রথম এটাই বলেছেন-

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

হে আমার কউম, আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই।

অর্থাৎ আমার আনুগত্য কর, তাজীম কর, সম্মান কর, সমস্ত কউম থেকে আমাকে আফজল মনে কর কিন্তু আমাকে খোদা বা খোদার সন্তান বা খোদার বরাবর বা- খোদাকে আমার মুখাপেক্ষী মনে কর না এবং এ রকম ধারণা পোষন করে আমার তাজ-ীম কর না। কেননা এ রকম ধারণা নিয়ে কারো তাজীম বা সম্মান ইবাদত হিসেবে গণ্য। খোদা ছাড়া অন্য কারো জন্য ইবাদত বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা সবাইকে কুরআন শরীফের সঠিক জ্ঞান দান করুক। এতে অনেক জ্ঞানী গুণী লোক হোচট খেয়ে থাকে।

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ- আল্লাহ ছাড়া

কুরআন শরীফে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ শব্দটি খুবই ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন তেলাওয়াত কারীগণের কাছে এটা অজানা নয় যে ইবাদত, হস্তক্ষেপ, সাহায্য, ওলী সাহায্যকারী, শহীদ, উকিল, সুপারিশকারী, হেদায়েত, গোমরাহ ইত্যাদির সাথে উপরোক্ত শব্দটি খুবই ব্যাপক ব্যবহৃত হয়েছে। আমিও ইতিপূর্বে আলোচিত বিষয় সমূহে এ রকম আয়াত সমূহ পেশ করেছি।

دُوْنَ শব্দের অর্থ- ছাড়া, ব্যতীত। কিন্তু এ অর্থ কুরআনের প্রতিটি আয়াতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদি প্রতিটি আয়াতে دُوْنَ এর অর্থ- 'ব্যতীত' করা হয়, তাহলে কোন কোন জায়গায় আয়াতের মধ্যে মারাত্মক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে এবং কোন কোন জায়গায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

আয়াতে সুস্পষ্টভাবে মিথ্যারোপ অপরিহার্য হয়ে পড়বে, যার সমাধান খুবই কঠিন হবে।

কুরআন করীম অধ্যয়ন করার দ্বারা বুঝা যায় যে এ دُوْن শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে– (১) ছাড়া, ব্যতীত, (২) মুকাবিলায়, (৩) আল্লাহকে ত্যাগ করে। যেখানে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ইবাদতের সাথে হবে বা ঐ ধরণের শব্দের সাথে হবে, যে গুলো ইবাদত বা মাবুদ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানে دُوْن শব্দের অর্থ হবে-ব্যতীত। কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত হতে পারে না। যেমন-

(১) فَلَا اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ-

তোমরা আল্লাহ ছাড়া পূজা যাদের কর, আমি ওদের পূজা করি না। কিন্তু আমিতো সেই আল্লাহকে পূজা করবো, যিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করে।

(২) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَايَضُرُّهُمْ وَلَايَنْفَعُهُمْ

কাফিরেরা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর পূজা করে যেগুলো ওদের না উপকার করতে পারে, না অপকার।

(৩) اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

জালিমদেরকে, তাদের স্ত্রীদেরকে ও আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা করতো, তাদেরকে একত্রিত কর।

এ রকম অনেক আয়াতে من دون الله এর অর্থ 'আল্লাহ ছাড়া', কেননা এসব আয়াতে من دون الله শব্দটা ইবাদতের সাথে এসেছে এবং ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হতে পারে না।

(৪) قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا ....

ওদেরকে বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা কর, আমাকে দেখাও দেখি ওরা কি সৃষ্টি করেছে?

(৫) وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

আল্লাহ ছাড়া তোমাদের মাবুদদেরকে ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(৬) اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْ اَوْلِيَاءَ

কাফিরেরা মনে মনে ঠিক করে রেখেছে যে আমি ছাড়া আমার বান্দাদেরকে মাবুদ বানিয়ে নিবে।

৫ ও ৬ নং আয়াতে دُوْن শব্দটি تَدْعُوْنَ এবং اَوْلِيَاءَ এর সাথে এসেছে, এবং এখানে যেহেতু تَدْعُوْنَ অর্থ ইবাদত ও اَوْلِيَاءَ অর্থ মাবুদ, সেহেতু دُوْن এর অর্থ হবে- 'ব্যতীত'।

কিন্তু যেখানে دُوْن শব্দটি نَصْر (সাহায্য) اَوْلِيَاء (বন্ধুত্ব) শব্দের সাথে আসবে, সেখানে এর অর্থ শুধু 'ব্যতীত' হবে না বরং 'আল্লাহর মুকাবিলায়' বা 'আল্লাহকে ত্যাগ করে' হবে। এ তফসীর ও অর্থে কোন সমস্যার সৃষ্টি হবে না। যেমন-

(১) اَنْ لَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ وَكِيْلًا

আমার মুকাবিলায় কাউকে উকীল নিয়োগ কর না।

(২) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ

তারা কি আল্লাহর মুকাবিলায় কিছু সুপারিশকারী তৈরী করে রেখেছে।

(৩) وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

আল্লাহর মুকাবিলায় না তোমাদের কোন বন্ধু আছে, না সাহায্যকারী।

(৪) وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

ওরা আল্লাহর মুকাবিলায় নিজেদের কোন বন্ধু পাবে না, পাবে না কোন সাহায্যকারী।

(৫) لَاتَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

মুমিন মুসলমানদের ত্যাগ করে কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করনা।

(৬) وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

যে খোদাকে ত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে সুস্পষ্টভাবে ধ্বংসে পতিত হলো।

(৭) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ

ওসব কাফিরদের জন্য আল্লাহর মুকাবিলায় কোন সাহায্যকারী নেই।

এ রকম যে সমস্ত আয়াতে সাহায্য-সহযোগীতা, ওকালতী, বন্ধুত্ব ইত্যাদি শব্দের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাথে دُوْن শব্দটি এসেছে, সেখানে دُوْن অর্থ শুধু 'ছাড়া' নয়, বরং সেই دُوْن দ্বারা আল্লাহর দুশমন বা প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝানো হয়েছে। সুতরাং ওসব আয়াতে دُوْن অর্থ 'মুকাবিলায়' করাটা যথার্থ। যে সব তফসীরকারক বা অনুবাদক دُوْن এর অর্থ 'ব্যতীত' করেছে, তাদের অভিপ্রায়ও 'ব্যতীত' বলতে এ রকম অর্থ বুঝানো হয়েছে। নিম্নের আয়াত সমূহে دُوْن শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(১) وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِنْۢ بَعْدِهٖ

যদি আল্লাহ তোমাদেরকে নাজেহাল করেন, তাহলে এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করে।

(২) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

আপনি বলে দিন, এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে, যদি আল্লাহ তোমাদের ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন বা কল্যান করার ইচ্ছে করেন। ওরা আল্লাহর মুকাবিলায় কোন বন্ধু পাবে না, পাবে না কোন সাহায্যকারী।

(৩) اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا

ওদের কি এমন কিছু ইলাহ আছে, যারা ওদেরকে আমার থেকে রক্ষা করবে?

উপরোক্ত আয়াত ব্যাখ্যা করে দিয়েছে যে যেখানে সাহায্য বা বন্ধুত্বের সাথে دون শব্দটি আসবে, সেখানে এর অর্থ 'মুকাবিলায়' বা 'ত্যাগ করে' হবে, কেবল ছাড়া বা ব্যতীত অর্থ হবে না।

তাছাড়া যদি এ জায়গায় دُوْن এর অর্থ-ব্যতীত করা হয়, তাহলে আয়াতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে এবং এ দ্বন্দ্বের অবসান খুবই কঠিন হবে। কেননা এখানে তো 'আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের অন্য ওলী (বন্ধু) বা সাহায্য কারী নেই' অর্থ করা হলো। কিন্তু যে সব আয়াত ওলী বা সাহায্যকারীর আলোচনায় পেশ করা হয়েছে, ওখানে বলা হয়েছে যে তোমার ওলী বা সাহায্যকারী হলো আল্লাহ, রসুল এবং মুমিনগণ বা তোমাদের সাহায্যকারী হলো ফিরিশতাগণ বা এরকম বলা হয়েছে-হে মওলা, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের সাহায্য কারী করে দিন।

আবার এসব আয়াতে دون এর অর্থ- ব্যতীত করা হলে যুক্তিরও বিপরীত হবে

এবং আল্লাহর কালাম (মাযাল্লা) মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। যেমন এখানে বলা হয়েছে- اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ (ওরা খোদা ছাড়া সুপারিশকারী ঠিক করে নিয়েছে।) সুপারিশকারীতো আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেউ হয়ে থাকে। আল্লাহতো সুপারিশকারী হতে পারে না। বা বলা হয়েছে-لَا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ وَكِيْلًا (আমাকে ছাড়া কাউকে উকীল বানিও না।) অথচ রাত দিনই উকিল বানানো হয়। এখন ওকীলের অর্থ যে যাই করুকনা কেন এবং সুপারিশকারী সম্পর্কেই যাই বলুক না কেন, মুশকিল আসান হবে না। তবে যদি এখানে دون এর অর্থ 'মুকাবিলায়' করা হয়, তাহলে বক্তব্য খুবই পরিস্কার বুঝা যায়। অর্থাৎ আল্লাহর মুকাবিলায় না ওকীল, না কোন সাহায্যকারী, না কোন সহায়তাকারী.না কোন বন্ধু আছে। যা কিছু আছে , সেটা আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাঁরই হুকুমে আছে। সুতরাং যেসব আয়াতে বান্দার সাহায্য-সহযোগিতা, ও বন্ধুতের অস্বীকৃতি রয়েছে, ওখানে 'আল্লাহর মুকাবিলার'অর্থ বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ ধবংস করতে চায় কিন্তু এরা সাহায্য করে রক্ষা করে আর যেসব আয়াতে বান্দার সাহায্য সহযোগিতার কথা বর্ণিত আছে, ওখানে আল্লাহর অনুমতিতে সাহায্য সহযোগিতা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

আপত্তি ঃ ও সব আয়াতে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ দ্বারা 'আল্লাহ ব্যতীত' বুঝানো হয়েছে এবং ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত অদৃশ্য থেকে মাধ্যম ছাড়া সাহায্যকারী কেউ নেই। এর বিপরীত আকীদা পোষন করা শিরক। যে সব আয়াতে আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য সহায়তার কথা বর্নিত আছে, ওখানে বর্তমান জীবিত আছেন এমন বান্দাদের অদৃশ্য মাধ্যমে সাহায্যের কথা বুঝানো হয়েছে। (জাওয়াহেরুল কুরআন)

জবাব ঃ কয়েকটি কারণে এ সমন্বয় বিধানটা একেবারে ভ্রান্ত। একেত: সাহায্যের অস্বীকৃতির আয়াত সমূহে কোন শর্ত নেই, সাধারণ ভাবে বলা হয়েছে। ওরা নিজ থেকে অদৃশ্য ভাবে, মাধ্যম বিহীন ও মৃতদের সাহায্য-এ শর্ত তিনটি মনগড়া আরোপ করেছে। কুরআনের কোন আয়াত হাদীছে ওয়াহেদ দ্বারাও শর্তযুক্ত করা যায় না কিন্তু ওরা নিজেদের মনগড়া ধারনা থেকে শর্তারোপ করছে। অথচ دون এর অর্থ যদি 'মুকাবিলায়' করা হয়, তাহলে কোন শর্তের প্রয়োজন পড়ে না। দ্বিতীয়ত:ওদের এ ব্যাখ্যা কুরআনের নিজস্ব ব্যাখ্যার বিপরীত। ইতোপূর্বে উল্লেখিত কুরআনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- এখানে دون অর্থ 'মুকাবিলায়'। অতএব ওদের এ ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা নয়, অপব্যাখ্যা। তৃতীয়ত: ওসব শর্তের পরও আয়াতের অর্থ দুরস্ত হয় না। কেননা হযরত ওমর (রাদি আল্লাহ আনহু) মদিনা মনোয়ারায় বসে হযরত সারিয়াকে কোন মাধ্যম ছাড়া সাহায্য করেছেন। ওনাকে দুশমনদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) কে অনেক দূর থেকে কোন মাধ্যম ছাড়া সাহায্য করেছেন। তিনি স্বীয় জামার মাধ্যমে আল্লাহর অনুমতিক্রমে ওনার চোখের দৃষ্টি শক্তি দান করেন। উল্লেখ্য যে জামা চক্ষুরোগ আরোগ্য করার মাধ্যম নয়। তাই এটা মাধ্যমবিহীন সাহায্য হিসেবে ধরে নিতে হবে। মূসা (আলাইহিস সালাম) স্বীয় ওফাতের পর কোন মাধ্যম ছাড়া আমাদের এ সাহায্য করেছেন যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজকে পাঁচ ওয়াক্ত করে দিয়েছেন। এ রকম হাজারো সাহায্যের কথা উল্লেখ করা যায়, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ অদৃশ্য ভাবে কোন মাধ্যম ছাড়া সাহায্য করেছেন। আপত্তিকারীরা নিজেরাই নিজেদের শর্তের উপর অটল থাকতে পারবে না। তাদের মতে অদৃশ্য সাহায্য নিষেধ হলে উপস্থিত সাহায্য নিশ্চয় জায়েয। তাহলে কোন জীবিত ওলীর কাছে গিয়ে সন্তান কামনা করা বা রসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম) এর রওযা পাকে গিয়ে হুযুরের কাছে জান্নাত প্রার্থনা করা এবং দোযখ থেকে পরিত্রান চাওয়া জায়েয। কিন্তু ওরাতো এগুলোকে শিরক বলে। তাই ওদের এ শর্ত ওদের মাযহাবেরও বিপরীত। অতএব এসব শর্ত বাতুলতা মাত্র। এ সব আয়াতে دون অর্থ 'মুকাবিলায়' যথার্থ।

نذر ونياز – নযর ও নিয়ায

কুরআন করীমে نذر (নযর) শব্দটি অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। نذر এর আভিধানিক অর্থ ভয় দেখানো অথবা ভয়ের কথা শুনানো। শরীয়তের পরিভাষায় নযর হচ্ছে অনাব্যশক ইবাদতকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয়া। প্রচলিত অর্থে নযর মানে নযরানা, হাদিয়া। এ শব্দটি কুরআন করীমে এ তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

(১) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

আমি আপনাকে সত্যিকারভাবে সুসংবাদদাতা ও ভয়ের কথা শুনানোকারী হিসেবে প্রেরন করেছি।

(২) وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

কোন উম্মত এমন ভাবে অতিবাহিত হয়নি যে তাদের মধ্যে ভয় প্রদর্শনকারী ছিল না।

(৩) أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا

তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য হতে এমন রসুল কি আসেনি, যিনি তোমাদের কাছে তোমাদের রবের বানী শুনাতেন এবং তোমাদেরকে যেই দিনের জমায়েতের ভয় দেখাতেন?

(৪) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى

আমি তোমাদেরকে ভয় দেখায়েছি প্রজ্জ্বলিত আগুন থেকে।

(৫) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

আমি বরকতময় রাত্রিতে কুরআন শরীফ নাযিল করেছি। আমি ভয় প্রদর্শনকারী।

এ রকম অনেক আয়াতে নযর শাব্দিক অর্থে অর্থাৎ ভয় দেখানো, ধমকানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে এ শব্দটি আল্লাহ তাআলা, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও ওলামায়ে দীনের বেলায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি শরয়ী অর্থেও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

(১) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

যা কিছু তুমি খরচ কর বা মানত কর আল্লাহ তা জানেন।

(২) رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي

হে আমার প্রভূ, আমার গর্ভে যে মুক্ত বাচ্চা আছে, সেটা আমি তোমার জন্য মানত করলাম। অতএব আমার থেকে এটা কবুল কর।

(৩) وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

এ লোকদের উচিৎ যে তাদের মানত পুরা করা এবং প্রাচীন ঘরের তওয়াব করা।

(৪) إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

আমি আল্লাহর জন্য রোযা মানত করেছি। অতএব আজ কারো সাথে কথা বলবো না।

এ ধরনের আয়াতে نذر (নযর) দ্বারা শরয়ী নযর বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানত করা এবং অপ্রয়োজনীয় ইবাদতকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেয়া। এ ধরনের নযর বা মানত ইবাদত হিসেবে গণ্য। এ জন্য এ ধরনের নযর বা মানত কোন বান্দার জন্য হতে পারে না। যদি কেউ কোন বান্দার জন্য এ রকম নযর বা মানত করে, তাহলে সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুশরিক হবে। কেননা খোদা ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত শিরক।

যেহেতু ইবাদতের জন্য এটা শর্ত যে, যার ইবাদত করা হয়, ওকে খোদা বা খোদার সমতুল্য মনে করা, সেহেতু এ নযর বা মানতের বেলায়ও একই শর্ত প্রযোয্য হবে। অর্থাৎ কাউকে খোদা বা খোদার সমতুল্য মনে করে ওর নামে নযর বা মানত করা। যদি মানতকারীর মনে এ ধরনের বিশ্বাস না থাকে বরং যার মানত করে, ওকে কেবল বান্দা মনে করে, তাহলে এটা শরয়ী নযর বলে গণ্য হবে না। এ জন্য ফকীহগণ নযর বা মানতে ইবাদতের শর্তারোপ করেছেন।

এটাও স্মরণ রাখা দরকর যে যদি কেউ বান্দার নামে শরয়ী নযর বা মানত করে অর্থাৎ বান্দাকে খোদাতুল্য মনে করে মানত করে, তাহলে সেই ব্যক্তি মুশরিক এবং ওর এ কাজ হারাম বলে গণ্য হবে। তবে সেই মানতকৃত জিনিস হালাল থাকবে। মানতকৃত জিনিসকে হারাম মনে করা মারাত্মক ভুল এবং কুরআনের বিপরীত হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান -

(১) مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ

বহীরা, (উপর্যপরি দশ শাবক প্রসবকারী পশু, যেটা দেবতার নামে উৎসর্গিত) সাইবা (দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া পশু) ওয়াসীলা (উপর্যপরি মাদী বাচ্চা প্রসবকারী উষ্ট্রী, যেটা দেবতার নামে উম্মুক্ত) এবং হাম (প্রজননকাজে নিয়োজিত বয়স্ক উষ্ট্র, যেটা দেবতার নামে উম্মুক্ত) আল্লাহ স্থির করেননি। মুশরিকরা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে।

আরবের কাফিরেরা এ চার প্রকারের পশু তাদের দেবতাদের নামে মানত করতো এবং ওগুলোর মাংস খাওয়াটা হারাম মনে করতো। আল্লাহ তাআলা তাদের এ ধারনাকে অগ্রাহ্য করে বলেন-এটা হালাল। আজকাল হিন্দুরা দেবতার নামে যে ষাঁড় ছেড়ে দেয়, সেটা হালাল। আল্লাহর নামে জবেহ করে সেটা খাওয়া যায়।

(২) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا- وَقَالُوْا هٰذِهٖ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ-

সেই কাফিরেরা ক্ষেতের ও পশুগুলোর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করলো এবং বললো-এটা আল্লাহর অংশ আমাদের ধারণা মতে, এবং এটা আমাদের শরীকদের অংশ। তারা বলতো এ পশু ও ফসল নিষিদ্ধ, এগুলো

খেয়ো না। তবে যাকে আমরা খাওয়াতে ইচ্ছুক সে খেতে পারবে।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে আরবের কাফিরেরা তাদের পশু ও ক্ষেতের অংশ বিশেষ দেবতাদের নামে মানত করতো এবং ওগুলো খাওয়া হয়তো একেবারে হারাম মনে করতো যেমন বহিলা, সাইবা জাতীয় পশু বা এগুলো খাওয়ার ব্যাপারে শর্তারোপ করতো যেমন পুরুষ খেতে পারবে, মহিলা পারবে না, অমুক খেতে পারবে, অমুক পারবে না। আল্লাহ তাআলা তাদের এ অভিমতদ্বয় নিম্নের আয়াত সমূহ দ্বারা খন্ডন করেছেন-

(১) وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ

তোমাদের মুখের মিথ্যা কথাকে এভাবে বল না যে ওটা হালাল এবং এটা হারাম।

(২) قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا

আপনি বলে দিন, দেখ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যা রিজিক প্রদান করেছেন, তোমরা সেখানে কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ।

(৩) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ -

বলে দিন, কে হারাম করেছে আল্লাহর সৌন্দর্যকে, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য প্রকাশ করেছে, এবং (কে হারাম করেছে) পবিত্র রিযিককে?

(৪) وَحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ

কাফিরেরা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে আল্লাহ ওদেরকে যে রিযিক দিয়েছে, সেটিকে হারাম মনে করেছে।

(৫) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

হে মুসলমানগণ, সেই পবিত্র জিনিস খাও যেটা আমি তোমাদের রিযিক হিসেবে দিয়েছি এবং আল্লাহর শোকর কর, যদি তোমরা তাঁর ইবাদত করে থাক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৬) وَمَالَكُمْ اَلَّا تَاكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

তোমাদের কি হয়েছে যে ওখান থেকে খাচ্ছনা যেটার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে।

(৭) اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

আল্লাহ তাআলা কেবল মৃত পশু-পাখী, রক্ত, শুকুরের মাংস এবং সেই পশু যেটা খোদা ভিন্ন অন্যের নামে জবেহ করা হয়, তোমাদের জন্য হারাম করেছেন।

(৮) قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ

নিশ্চয় ওরা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহর উপর অপবাদ দিয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে মূর্খতাবশত: হত্যা করে ফেলেছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে হারাম করে নিয়েছে।

এসব আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরবের কাফিরদের সেই ভ্রান্ত আকীদা অর্থাৎ যে পশু বা ফসল দেবতার নামে উৎসর্গিত হয় সেটা হারাম হয়ে যাওয়ার ধারনাকে জোরালো ভাবে খন্ডন করেছেন এবং বলেছেন- তোমরা-আল্লাহর প্রতি অপবাদ দিচ্ছ। আল্লাহ এসব জিনিস হারাম করেনি। তোমরা কেন হারাম মনে কর? এর থেকে বুঝা যায় মুর্তির নামে মানত করা শিরক ছিল এবং ওদের একাজ বড় অপরাধ ছিল, কিন্তু সেই জিনিসকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন, এবং হারামকারীদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। সেটাকে হালাল রিযিক ও পবিত্র রুযি বলেছেন। ওসর মুর্তিদের নামে ছেড়ে দেয়া পশুগুলো সম্বন্ধে বলেছেন- আল্লাহর নামে জবেহ করে খাও, কাফিরদের কথা শুন না। অনুরূপ এখনও যে জিনিস খোদা ভিন্ন অন্য কারো নামে নযর বা মানত করা হয়, সেটা হালাল ও পবিত্র, যদিওবা মানতটা শিরক।

নযরের তৃতীয় অর্থ ব্যবহারিক বা প্রচলিত। অর্থাৎ কোন বুজুর্গকে কোন জিনিস হাদিয়া, নযরানা তোহ্ফা দেয়া বা দেয়ার নিয়ত করা বা এ রকম নিয়ত করা যে আমার অমুক কাজ হয়ে গেলে, আমি হুযুর গাউছে পাকের নামে ডেক পাঠাবো অর্থাৎ ডেক ভরে খারার তৈরী করে আল্লাহর নামে দান করবো এবং এর ছওয়াব সরকারে বাগদাদ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর রূহের প্রতি নযরানা হিসেবে পেশ করবো। এ রকম নযর বা মানত সম্পুর্ণ জায়েয। সাহাবায়ে কিরাম এ রকম নযর বা মানত হুযুরের নামে করেছেন

এবং পেশ করেছেন। হুযুর তা কবুল করেছেন। এ রকম মানত হারাম নয় এবং মানতকৃত জিনিসও হারাম নয়। একে সাধারণ লোকদের পরিভাষায় নিয়ায বা নযরানা বলা হয়। কুরআন শরীফে এর প্রমান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে অনেক সহীহ হাদীছও রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ اَلَا اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

এমন কিছু বেদুইন আছে, যারা আল্লাহ ও কিয়ামত বিশ্বাস করে এবং যা কিছু দান করে একে আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও রসুলের দুআ লাভের উপায় মনে করে। নিশ্চয় এটা ওদের জন্য নৈকট্য লাভের সহায়ক হবে। আল্লাহ তাআলা শীঘ্রই ওদেরকে তাঁর রহমতের অন্তর্ভূক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়াবান।

এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে মুমিনগন তাদের দান খয়রাতে দুটি নিয়ত করে থাকেন, এক-আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর ইবাদত, দুই, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দুআ অর্জন। বুজুর্গানে কিয়ামের নামে ফাতেহা দানকারীরা বা ওনাদের নামে মানতকারীদের মকদুদ এটাই হয়ে থাকে যে দান খয়রাত আল্লাহর জন্য এবং ছওয়াব নির্দিষ্ট বুযুর্গের জন্য, যাতে ওনার আত্মা সন্তুষ্ট হয়ে ওদের জন্য দুআ করে। এ জন্যই সাধারন লোকেরা বলে থাকে-আল্লাহর জন্য নযর,হোসাইনের জন্য নিয়ায। এতে কোন ক্ষতি নেই। একবার নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যখন এক যুদ্ধ থেকে সহীহ সালামতে ফিরে আসলেন, তখন এক বালিকা আরয করলো-

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ نَذَرْتُ اِنْ رَدَّكَ اللّٰهُ صَالِحًا اَنْ اَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَاُتَغَنِّىْ بِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِىْ وَاِلَّا فَلَا

হুযুর, আমি মানত করেছিলাম যে আল্লাহ আপনাকে সহীহ সালামতে ফিরায়ে আনলে আপনার সামনে দফ বাজাবো ও গান করবো। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, যদি তুমি মানত করে থাক, তাহলে বাজাও, অন্যথায় বাজাইওনা। (মিশকাত, মনাকেবে ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) অধ্যায়)

এ হাদীছে নযর শব্দটি সেই নযরানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, শরয়ী নযর অর্থে নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেননা গান বাজনা ইবাদত নয়। কেবল নিজের মনের আনন্দের নযরানা পেশ করাই উদ্দেশ্য ছিল, এবং সেটাতে হুযুরের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছিল। এটা হলো প্রচলিত নযর, যেটা একজন মহিলা সাহাবী মানত করেছিলেন এবং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তা পূর্ণ করার জন্য বলেছিলেন।

একই জায়গায় সেই মিশকত শরীফের পাদটীকায় মোল্লা আলী কারীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে-

وَاِنْ كَانَ السُّرُوْرُ بِمَقْدَمِهِ الشَّرِيْفِ نَفْسَهُ قُرْبَةٌ

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর তশরীফ আনয়নে আনন্দ প্রকাশ করা ইবাদত।

মোটকথা এ ধরনের প্রচরিত নযর নিয়ায সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত আছে। উস্তাদ, মা-বাপ ও মুরশিদকে নযরানা দেয়া হয়। একে শিরক বলাটা শেষ পয্যায়ের মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়।

خاتم النّبيّن – সর্বশেষ নবী

خَاتَمْ শব্দটি حتم শব্দ থেকে গঠন করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে মোহর লাগানো। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে শেষ করা, সমাপ্ত করা, বন্ধ করা, কারণ মোহর কোন কিছু লিখার শেষে মারা হয়, যদ্বারা লিখার সমাপ্তি বুঝা যায় অথবা পার্সেল বন্ধ করার পর মোহর লাগানো হয়, যাতে ওখানে কোন কিছু ঢুকানো বা বের করা না যায়। এ জন্য কোন কিছুর সমাপ্তিকে খতম বলা হয়। কুরআন শরীফে এ শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান -

(১) خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ

আল্লাহ তাআলা ওসব কাফিরদের অন্তরে ও কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন।

(২) اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

আজ আমি তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব। ওরা যা করতো, তা ওদের হাত আমাকে বলবে এবং ওদের পা সাক্ষ্য দিবে।

(৩) فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ

আল্লাহ যদি চান, আপনার অন্তরে রহমত ও হেফাজতের মোহর লাগিয়ে

দিবেন।

(৪) يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ

মোহর কৃত মশকের (চামড়ার পাত্র) পবিত্র শরাব পান করানো হবে।

এ ধরণের সমস্ত আয়াতে حتم (খতম) মোহর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যখন কাফিরদের অন্তরে ও কানে মোহর লেগে গেছে, তখন ওখানে ঈমানের প্রবেশ বা ওখান থেকে কুফর বের হওয়ার সুযোগ নেই। অনুরূপ জান্নাতে এ রকম সীলমোহর যুক্ত পবিত্র শরাব পান করানো হবে, যেখানে ভেজাল করার কোন সুযোগ থাকবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ-

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)- তোমাদের কারো বাপ নয়, তিনি আল্লাহর রসুল ও সর্বশেষ নবী।

এ আয়াতে خاتم শব্দটি প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ সর্বশেষ ও সকলের পরে। তাই হুযুরের পরে কারো নবুয়াত লাভ অসম্ভব। নিম্নের আয়াত সমূহে এ অর্থের প্রতি জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়।

(১) اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীন পূর্ন করে দিলাম এবং পূর্ন করে দিলাম তোমাদের উপর আমার নেয়ামত।

(২) ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ

অতপর তোমাদের কাছে সেই রসূল তশরীফ এনেছেন, যিনি তোমাদের কিতাব সমূহের স্বীকার করেন, যাতে তোমরা সবাই তাঁর উপর ঈমান আন ও তাঁর সাহায্য কর।

(৩) وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) রসূলই। তাঁর আগের সমস্ত রসূল বিদায় হয়ে গেছেন।

(৪) فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاءِ شَهِيْدًا-

pdf By Syed Mostafa Sakib

তখন কি রকম হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থাপন করবো এবং হে মাহবুব, আপনাকে ওদের সাক্ষী ও রক্ষক হিসেবে আনয়ন করা হবে।

এ আয়াত সমূহ দ্বারা চারটি বিষয় জানা গেল। এক, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দীন পূর্ণাঙ্গ এবং এ দীন পরিপূর্ন হওয়ার পর কোন নবীর প্রয়োজন নেই। দুই, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বিগত সমস্ত নবীগনকে স্বীকার করেন কিন্তু কোন নতুন নবীর আগমনি খবর দেননি। যদি তাঁর পরে কোন নবী আসতেন, তাহলে ওনার সুসংবাদও দিতেন। তিন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সমস্ত নবীগন ও ওনাদের উম্মতদের সাক্ষী। কিন্তু কোন নবী হুযুরের বা হুযুরের উম্মতের সাক্ষী নয়। এতে বুঝা যায় তাঁর পরে কোন নবী নেই। চার, সমস্ত নবী তাঁর আগে চলে গেছেন, কোন নবী অবশিষ্ট নেই।

আপত্তি নং ১ ঃ খাতেমুন নবীয়ীনের অর্থ নবীগনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমন বলা হয়ে থাকে যে অমুক ব্যক্তি খাতেমুশ শোয়ারা বা খাতেমুল মুহাদ্দেসীন অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ শায়ের বা মুহাদ্দিস। এখানে খাতেম দ্বারা সর্বশেষ বুঝায়নি। নবী করীম(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) কে বলেছেন- اَنْتَ خَاتَمُ الْمُهَاجِرِيْنَ তুমি মুযাজিরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখানে খাতেম অর্থ শেষ নয়। কেননা হিজরততো কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। তাই তাঁর পরেও নবী আসতে পারে। তবে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। এটাই খাতেমুন নবীয়ীনের অর্থ।

জবাবঃ খাতেম শব্দটি খতম শব্দ থেকে গঠন করা হয়েছে, যার অর্থ শ্রেষ্ঠ নয়। অন্যথায় خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ (আল্লাহ কাফিরদের মনে সীলমোহর মেরে দিয়েছেন) এর অর্থ হবে, আল্লাহ কাফিরদের মন শ্রেষ্ঠ করে দিয়েছেন। যখন খতম অর্থ শ্রেষ্ঠ নয়, তাহলে খতম থেকে গঠিত খাতেম শব্দের অর্থ কি করে শ্রেষ্ঠ হতে পারে। লোকেরা কাউকে অতিরঞ্জিত করে হাতেমুশ শোয়ারা (সর্ব শেষ শায়ের) বলে থাকে। যেন ওর মত শায়ের আর আসবে না। যেমন বলা হয় যে অনুকের পর শের বলা খতম হয়ে গেছে,ওর মত আর শায়ের হবে না। আল্লাহ তাআলার বানী অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা থেকে পবিত্র। মক্কা মুকাররামা থেকে মদীনা মনোয়ারা হিজরত কারীগনের মধ্যে সর্বশেষ মুহাজির ছিলেন হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহ আনহু) কেননা তার হিজরত মক্কা বিজয়ের দিন হয়েছিল। এরপর হিজরত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ওখানেও খাতেম শব্দটি শেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সরকারে দুআলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমায়েছেন لَاهِجْرَةَ بَعْدَ الْيَوْمِ আজকের পর মক্কা থেকে আর হিজরত

হবে না। যদি ওখানে খাতেম অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ করা হয়, তাহলে হযরত আব্বাসকে নবী করীম(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে শ্রেষ্ঠ বলাটা অপরিহার্য হবে। কেননা হুযুরও একজন মুহাজির।

আপত্তি নং ২ ঃ যদি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শেষ নবী হন, তাহলে ঈসা (আলাইহিস সালাম) কেন তাঁর পরে আসবে? শেষ নবীর পরেতো কোন নবী না হওয়া চায়।

জবাব ঃ শেষ নবীর অর্থ হলো তাঁর যুগে বা তাঁর পরে আর কোন নবী অবশিষ্ট নেই। শেষ সন্তান মানে এরপর আর কোন সন্তান জন্ম না হওয়া কিন্তু এর অর্থ আগের সব সন্তান মরে যাওয়া নয়। তাছাড়া হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর আগমন হবে নবী হিসেবে নয় বরং হুযুরের উম্মত হিসেবে। অর্থাৎ তিনি ওসময়ের নবী কিন্তু এসময়ের উম্মত। যেমন কোন জজ সাহেব অন্য জজের আদালতে সাক্ষ্য দিতে গেলে তিনি নিজ আদালতে জজ হলেও সেই আদালতে সাক্ষী হিসেবে গন্য। হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সম্রাজ্যে তাঁর দীনের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আসবেন।

বিঃ দ্রঃ ختم শব্দের অর্থ যখন মোহর হয়, তখন এর পরে প্রকাশ্যে বা উহ্যে عَلٰى অব্যয় অবশ্যই ব্যবহৃত হয়। যেমন আমার উদ্ধৃত আয়াত থেকে তা প্রকাশ পায়। আর যখন ختم অর্থ শেষ বা সমাপ্তি করা হবে, তখন عَلٰى অব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। যেমন খাতেমুন নবীয়ীন শব্দে عَلٰى প্রকাশ্যে বা উহ্যে নেই। তাই এখানে খাতেমুন নবীয়ীন অর্থ শেষ নবীই হবে।

বিঃ দ্রঃ খাতেমুন নবীয়ীন অর্থ যে শেষ নবী, তা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং বলেছেন এবং এ ব্যাপারে উম্মতের সর্বসম্মতি রয়েছে। এখন শেষ যুগে এসে মওলানা মুহাম্মদ কাসেম দেওবন্দী ও মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এর নতুন অর্থ আবিস্কার করেছে। তাদের মতে খাতেমুন নবীয়ীন অর্থ আসল নবী, শ্রেষ্ঠ নবী এবং সেই সর্বসম্মত অর্থকে অস্বীকার করলো। এ জন্য আরব আযমের আলেমগন তাদের উপর কুফরীর ফতওয়া দিয়েছেন। কুরআন মজীদের শব্দসমূহ অস্বীকার করা যেমন কুফরী, তেমন এর সর্বসম্মত অর্থকে অস্বীকার করাও কুফর। যদি কেউ বলে اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ (নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর) এ আয়াতের উপর আমার বিশ্বাস আছে, এটা আল্লাহর বানী। কিন্তু সালাত অর্থ নামাজ নয় বরং এর অর্থ দুআ। অবশ্য নামাযও এ অর্থের অন্তর্ভূক্ত এবং যাকাতের অর্থ সদকায়ে ওয়াজেব নয় বরং এর অর্থ পবিত্রতা, অবশ্য সদকা খয়রাত এর অন্তর্ভূক্ত; তাহলে সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাফির। কেননা সে যদিওবা কুরআনের শব্দ সমূহের অস্বীকার করেনি কিন্ত যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সর্বসম্মত অর্থকে অস্বীকার করেছে। এ অবস্থায় নামাযকে ফরয মনে করলেও কুরআনে উল্লেখিত যদি সালাত অর্থ যদি নামায না করে, তাহলে সে কাফির।

তাছাড়া নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমস্ত গুনাবলী মানাটা ঈমানের জন্য অপরিহার্য। যেমন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হলেন নবী, রসুল, গুনাহগারদের সুপারিশকারী, সমস্ত জগতের রহমত। অনুরূপ তিনি খাতেমুন নবীয়ীন (শেষ নবী অর্থে)। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নবুয়াত ঐ রকম অর্থে স্বীকার করা অবশ্যক, যে রকম অর্থে মুসলমানেরা স্বীকার করে। "খাতেমুন নবীয়ীন"ও সেই অর্থে স্বীকার করা অবশ্যক, যেটা মুসলমানদের আকীদা।

আরও উল্লেখ্য যে, যেমন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বাক্যাংশে اِلٰهَ শব্দটি অনিদিষ্ট এবং না বোধক শব্দের পরে এসেছে। তাই এর অর্থ হবে আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকারের কোন মাবুদ নেই- না আসল, না প্রতিচ্ছবি, না রূপক। অনুরূপ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ বাক্যাংশের মধ্যে নবী শব্দটি অনির্দিষ্ট এবং না বোধক শব্দের পরে এসেছে, যার অর্থ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পরে কোন প্রকারের নবী - আসল নকল বা অন্য প্রকৃতির নবী আসা এরকম অসম্ভব, যেরকম দ্বিতীয় ইলাহ হওয়া অসম্ভব। যে ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পর নবীর আগমন সম্ভব মনে করে, সেও কাফির। সুতরাং দেওবন্দী ও কাদিয়ানী খতমে নবুয়াতের অস্বীকারের কারনে উভয়ই মুরতেদ। আল্লাহ তাআলা ফরমান-

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا

হে সাহাবীগন, তোমাদের ঈমানের মত যদি ঈমান আনে, তাহলে হেদায়েত পেয়ে যাবে।সাহাবীগন হুযুরের পর কোন নবী স্বীকার করেননি। সুতরাং পরবর্তীতে কাউকে নবী হিসেবে মান্য করা গোমরাহী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআনী কায়দা-কানুন

প্রথম অধ্যায়ে জানা গেল যে কুরআন শরীফে একই শব্দ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় শব্দের সেই অর্থই চায় যেটি সেই জায়গায় যথাযথ হয়। এ অধ্যায়ে সেই কায়দাগুলো বর্ননা করা হবে, যেগুলোর দ্বারা বুঝা যাবে যে কোন্ জায়গায় কোন্ শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কায়দা বা নিয়মগুলো খুবই মনোযোগ সহকারে জেনে নিন, যাতে কুরআনের অনুবাদে ভুল না হয়।

কায়দা নং ১ঃ (ক) যখন ওহীর ইঙ্গিত নবীর দিকে হবে, তখন এর অর্থ হবে ফিরিশতার মাধ্যমে নবীর সাথে আল্লাহর কথা বলা।

(খ) যখন ওহীর ইঙ্গিত নবী ভিন্ন অন্য কারো দিকে হবে, তখন ওহীর অর্থ হবে মনে প্রবিষ্ট করা বা ধারনা সৃষ্টি করে দেয়া।

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি, যেমন ওহী করে ছিলাম নূহ ও ওনার পরবর্তী নবীগনের প্রতি।

(২) وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ

নূহের প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, এখন আর তোমার কাউমের মধ্যে কেউ ঈমান আনবে না, তবে ইতোমধ্যে যারা ঈমান এনেছে।

এধরনের অনেক আয়াতে ওহী দ্বারা খোদায়ী ওহী বুঝানো হয়েছে, যা নবীগনের উপর নাযিল হয়েছে।

(খ) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ

তোমার প্রভূ মৌমাছির মনে এ ধারনা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে তারা যেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাহাড়সমূহে, বৃক্ষ সমূহে ও ঘরের ছাদসমূহে ঘর বানায়।

(২) وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَاۤءِهِمْ

নিশ্চয় শয়তানেরা ওদের বন্ধুদের মনে কুমন্ত্রনা দিয়ে থাকে।

(৩) وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ

আমি মূসা আলাইহিস সালামের মায়ের মনে এ ধারনা দিয়েছিঁ যে সে যেন ওনাকে দুধ পান করায়।

এ আয়াত সমূহে ওহীর ইঙ্গিত যেহেতু মৌমাছি, শয়তান বা মূসা (আলাইহিস সালাম) এর মায়ের দিকে করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে কেউ নবী নয়, সেহেতু এখানে ওহীর অর্থ নবুয়াতের ওহী নয় বরং মনে ধারনা সৃষ্টি করার অর্থই বুঝানো হয়েছে।

কোন সময় ওহী সেই কথোপকথনকেও বলা হয়, যেটা ফিরিশতার মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ ও নবীর মধ্যে হয়। যেমন-

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى

দু'ধনুকের মাঝখানের ফাঁক বা এর থেকে আরও কম ব্যবধানে হয়ে গেলেন। তারপর তাঁর বান্দাকে যা বলার আছে, তা বললেন।

মেরাজের রাত্রে নৈকট্যের বিশেষ সময়ে ফিরিশতার মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ তাআলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথা বলেছেন। একে ওহী বলা হয়েছে।

কায়দা নং ২ঃ- (ক) যখন আবদ শব্দের ইঙ্গিত আল্লাহর দিকে হয়, তখন এর অর্থ হয় মখলুক, ইবাদতকারী বা বান্দা।

(খ) যখন আবদের ইঙ্গিত বান্দার দিকে হয়, তখন এর অর্থ হবে খাদেম, চাকর।

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى

তিনি পবিত্র যিনি তাঁর বিশেষ বান্দাকে রাতরাতি মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন।

(২) وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ

আমার বান্দা আয়ুবের কথা স্মরন কর।

(৩) اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ

হে ইবলিস, আমার বিশেষ বান্দার উপর তুমি জয়ী হতে পারবে না।

এ সব আয়াতে আব্‌দের ইঙ্গিত যেহেতু আল্লাহর দিকে করা হয়েছে, সেহেতু এখানে আব্‌দের অর্থ বান্দা, ইবাদতকারী হবে।

(খ) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ

তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত আছে, এবং তোমাদের গোলাম ও বাদীদের বিবাহ করায়ে দাও।

(২) قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

আপনি বলে দিন, হে আমার গোলামগন, যারা নিজেদের জানের উপর অত্যাচার করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হয়ো না।

এ ধরনের আয়াতে আবদ শব্দের ইঙ্গিত বান্দার দিকে করা হয়েছে। তাই এখানে এর অর্থ বান্দা বা মখলুক হবে না বরং এখানে আবদের অর্থ হবে খাদেম, গোলাম। তাই আবদুন নবী ও আবদুর রসুলের অর্থ নবীর গোলাম।

কায়দা নং ৩ ঃ (ক) যখন রব শব্দের ইঙ্গিত আল্লাহর দিকে হবে, তখন এর অর্থ হবে আসল পালনকর্তা অর্থাৎ আল্লাহ।

(খ) যখন কোন বান্দাকে রব বলা হয়, তখন এর অর্থ হবে মুরব্বী, ইহসানকারী, লালনপালনকারী।

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর যিনি সমগ্র জগতের প্রভূ।

(২) رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ

তিনি তোমাদের ও তোমাদের বাপ-দাদাদের প্রভূ।

(৩) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ

বলে দিন, আমি মানুষের প্রভূর কাছে পানাহ চাচ্ছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ আয়াত সমুহে যেহেতু আল্লাহ তাআলাকে রব বলা হয়েছে, সেহেতু এর অর্থ প্রকৃত পালনকর্তা।

(খ) এর উদহরণ ঃ-

(১) اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ

তোমার মুরব্বী (বাদশাহ) এর কাছে ফিরে যাও। অতপর ওনাকে জিজ্ঞেস কর, ওসব মহিলাদের কি অবস্থা, যাদের হাত কেটে ছিল।

(২) قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বললেন, আল্লাহর পানাহ, তিনি আমার মুরব্বী। তিনি আমাকে ভাল ভাবে রেখেছেন।

এ আয়াত সমুহে বান্দাদেরকে রব বলা হয়েছে। তাই এ সব আয়াতে রব অর্থ মুরব্বী ও লালন-পালন কারী হবে।

কায়দা নং ৪ ঃ- (ক) যখন ضَلَال (দলাল) শব্দটির ইঙ্গিত নবী ছাড়া অন্য কারো দিকে হবে, তখন এর অর্থ হবে গোমরাহ।

(খ) যখন ضَلَال (দলাল) এর ইঙ্গিত নবীর দিকে হবে, তখন এর অর্থ হবে প্রেমে বিভোর বা পথ সম্পর্কে অনবহিত।

(ক) এর উদাহরন ঃ

(১) وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ

যাকে আল্লাহ গোমরাহ করে ওকে হেদায়েতকারী কেউ নেই।

(২) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

ওদের পথে পরিচালিত কর না, যাদের উপর গজব হয়েছে এবং না গোমরাহদের পথেও।

(৩) وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

যাকে আল্লাহ গোমরাহ করে, তুমি ওর জন্য কোন সাহায্যকারী পথ প্রদর্শক পাবেনা।

এ সব আয়াতে ضَلَال শব্দটির সম্পর্ক যেহেতু নবীর সাথে নয়, সেহেতু এর অর্থ গোমরাহী। এ গোমরাহী বলতে কুফর শিরক ও অন্যান্য গোমরাহীমূলক সব কিছুকে বুঝায়।

(খ) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى

হে মাহবুব, আপনাকে আল্লাহ তাঁর প্রেমে বিভোর পেয়েছেন। তাই তাঁর পথ দেখায়ে দিয়েছেন।

(২) قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ

ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) এর সন্তানগন বললেন, খোদার কসম, আপনি তো আপনার সেই পুরানো বিভোরতায় রয়ে গেছেন।

(৩) قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ

মুসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, কিবতীকে মারার কাজটা আমি যখন করেছিলাম তখন আমি বিভোর ছিলাম অর্থাৎ জানতাম না যে ঘুষি মারার দ্বারা কিবতী মারা যাবে।

এ ধরণের আয়াতে ضَلَال শব্দের অর্থ গোমরাহ হতে পারে না। কেননা নবীগণ এক মূহুর্ত্বের জন্যও গোমরাহ ছিলেন না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوٰى

তোমাদের নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কখনও বিপথগামী হননি, না বিপথে চলেছেন।

(২) لَيْسَ بِىْ ضَلَالَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ

হযরত শোয়ায়েব (আলাইহিস সালাম) বলেছেন, আমি গোমরাহ নই। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল।

এ আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল যে নবী গোমরাহ হতে পারে না। (২) নং আয়তে لٰكِن শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে নবুয়াত ও গোমরাহী একত্রিত হতে পারে না।

কায়দা নং ৫ ঃ (ক) مَكر (মকর) خِدَاع (খেদা) শব্দের ইঙ্গিত যখন আল্লাহর দিকে হয়, তখন এর অর্থ ধোঁকা বা চালবাজি হবে না বরং এর অর্থ হবে ধোঁকার শাস্তি প্রদান বা গোপন তদবীর।

(খ) যখন مَكر বা خِدَاع শব্দের ইঙ্গিত বান্দার দিকে হয়, তখন مَكر এর অর্থ হবে ধোঁকা , প্রতারনা দাগাবাজি এবং خِدَاع এর অর্থ হবে চালবাজি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উদাহরণ ঃ-

(১) يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

ওরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়। আল্লাহ ওদেরকে শাস্তি দিবেন বা ওদের জন্য গোপন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(২) يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ

মুনাফিকরা আল্লাহকে ও মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে চায়, কিন্তু ওরা নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে।

(৩) وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهِ – وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ

মুনাফিকরা চালবাজি করেছে এবং আল্লাহ ওদের বিরুদ্ধে গোপন তদবীর করেছেন। আল্লাহ তদবীরকারীদের মধ্যে সবচে উত্তম।

এ ধরনের আয়াতে, যেখানে مَكر বা خِـــداع কর্মের কর্তা হলো কাফিরগণ সেখানে এর অর্থ হচ্ছে ধোঁকা বা চালবাজি এবং যেখানে مكر বা خداع কর্মের কর্তা হলো আল্লাহ, সেখানে এর অর্থ হচ্ছে ধোঁকাবাজির সাজা বা গোপন তদবীর।

কায়দা নং ৬ ঃ (ক) যখন تَقْوٰى এর ইঙ্গিত আল্লাহর দিকে হয়, তখন এর অর্থ হবে ভয় করা।

(খ) যখন تَقْوٰى এর ইঙ্গিত আগুন বা কাফির বা গুনাহের দিকে হয়, তখন এর অর্থ হবে বাঁচা।

উদাহরণ ঃ-

(১) يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ

হে লোকেরা, তোমাদের সেই খোদাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

(২) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

সেই আগুন থেকে বাঁচ, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর ।

প্রথম আয়াতে اِتَّقُوْا এর অর্থ ভয় করা, কেননা এর ইঙ্গিত আল্লাহর দিকে রয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে اِتَّقُوْا এর অর্থ বাঁচ। কেননা এর ইঙ্গিত রয়েছে আগুনের দিকে।

কায়দা নং ৭ ঃ (ক) مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ যখন عِـبَـادَتْ শব্দের সাথে আসে,

তখন এর অর্থ হবে- আল্লাহ ব্যতীত।

(খ) مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ যখন ولايت، نصرت، مدد এবং دعا (ডাকা অর্থে) শব্দের সাথে আসে, তখন এর অর্থ হবে- আল্লাহর মুকাবিলায়।

(ক) এর উদাহরণঃ

(১) اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর, সব দোযখের ইন্ধন।

(২) وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য মাবুদের পূজা করে।

(৩) وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহর। তাই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কারো পূজা কর না।

এ রকম সমস্ত আয়াতে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এর অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত। কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত জায়েয নেই।

(খ) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

আল্লাহর মুকাবিলায় তোমাদের কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই।

(২) اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُوْنِنَا

ওদের কাছে কি এমন কোন মাবুদ আছে, যে আমার মুকাবিলায় ওদেরকে রক্ষা করবে।

(৩) لَاتَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَكِيْلًا

আমার মুকাবিলায় কাউকে উকিল ধর না।

(৪) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ

তারা কি আল্লাহর মুকাবিলায় সুপারিশকারী গ্রহন করেছে।

এ রকম সমস্ত আয়াতে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এর অর্থ হবে- আল্লাহর মুকাবিলায় অর্থাৎ আল্লাহর মুকাবিলায় তোমাদের এমন কোন সাহায্যকারী, সহায়তাকারী, সুপারিশকারী বা উকীল নেই, যে আল্লাহর সাথে মুকাবিলা করে তোমাদেরকে আজাব

pdf By Syed Mostafa Sakib

থেকে রক্ষা করবে। যদি এ সব আয়াতে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এর অর্থ 'ব্যতীত' করা হয়, অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই, তাহলে ওসব আয়াতের সাথে দ্বন্দ্ব হবে, যেগুলোতে বান্দাদেরকে সাহয্যকারী বলা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নের আয়াত গুলোতে এ অর্থের জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়।

(১) مَنْ ذَاالَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَبِكُمْ سُوْٓءً

সে কে, যে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের অকল্যান চায়।

(২) وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَاالَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ

যদি তোমাদেরকে আল্লাহ নাজেহাল করেন, তাহলে এমন কে আছে, যে এর পরে তোমাদেরকে সাহায্য করে?

এ আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে যে কোন বান্দা আল্লাহর বিপরীত হয়ে তাঁর মুকাবিলায় কাউকে না বাঁচাতে পারে, না সাহায্য করতে পারে। তবে তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর সম্মতিতে বান্দা সাহায্যকারী, সুপারিশকারী, সহায়তাকারী ও উকীল হতে পারে।

কায়দা নং ৮ ঃ (ক) وَلِىّ (ওলী) শব্দটি যখন আল্লাহর মুকাবিলায় আসে, তখন এর অর্থ হবে মাবুদ বা প্রকৃত মালিক। এ ধরনের ওলী গ্রহন শিরক ও কুফর।

(খ) যদি وَلِىّ শব্দটি আল্লাহর মুকাবিলায় না হয়, তাহলে এর অর্থ হবে বন্ধু, সাহায্যকারী, নিকট আত্মীয় ইত্যাদি।

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَآءَ

কাফিরেরা কি মনে করেছে যে আমাকে বাদ দিয়ে আমার বান্দাদেরকে মাবুদ বানিয়ে নিবে।

(২) مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا

যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ সাব্যস্ত করেছে, তাদের উদাহরন মাকড়সার মত , যে ঘর তৈরী করেছে।

(৩) وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ

যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্য মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে।

এ ধরনের আয়াত সমূহে وَلِىّ অর্থ মাবুদ বা প্রকৃত মালিক।

(খ) এর উদাহরণ ঃ-

(১) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ-

তোমাদের বন্ধু বা সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং ও সমস্ত মুমিন বান্দাগণ, যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে।

(২) وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে বন্ধু ঠিক করে দিন এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দিন।

এ ধরনের আয়াতে وَلِىّ অর্থ মাবুদ নয়, বরং বন্ধু, সাহায্যকারী ইত্যাদি। কেননা এখানে আল্লাহর মুকাবিলায় وَلِىّ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। এ সম্মর্কে বিস্তারিত আলাচনা প্রথম অধ্যায়ে করা হয়েছে।

কায়দা নং ৯ ঃ (ক) যখন دُعَا (দুআ) শব্দের পর আল্লাহর দুশমনের কথা বর্ণিত হয় বা دُعَا (দুআ) এর কর্তা কাফির হয় বা দুআর উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায় বা দুআকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা কাফির মুশরিক, গোমরাহ বলেছেন, তখন دُعَا অর্থ হবে ইবাদত, পূজা করা ইত্যাদি, তখন دُعَا শব্দের অর্থ ডাকা বা আহবান করা বুঝাবে না।

(খ) যখন دُعَا শব্দের সাথে আল্লাহ তাআলার কথা বর্নিত হয়, তখন دُعَا এর অর্থ হবে ডাকা, দুআ প্রার্থনা ইত্যাদি। যেখানে যে অর্থ প্রযোজ্য, সেখানে সে অর্থ করতে হবে।

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

ওর থেকে বড় গোমরাহ আর কে আছে, যে আল্লাহকে ছাড়া এমন কিছুর পূজা করে, যে গুলো কিয়ামত পর্যন্ত এর জবাব দিবে না।

(২) اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিশ্চয় মসজিদগুলো হচ্ছে আল্লাহর। তাই আল্লাহর সাথে অন্য কারো পূজা কর না।

(৩) هُوَ الْحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَ فَادْعُوْهُ

তিনিই চির জীবিত, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। অতএব তাঁকেই পূজা কর।

এ রকম সমস্ত আয়াতে دعا এর অর্থ হবে পূজা বা ইবাদত করা, ডাকা বা আহবান করা নয়। এ ধরণের আয়াতের অর্থ এ রকমই হবে যে আল্লাহ ছাড়া কারো পূজা কর না। এ ধরণের আয়াতের ভাবার্থ এ রকম হবে না যে কাউকে ডাক না বা আহবান কর না।

(খ) এর উদাহরণ ঃ

(১) اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

তোমদের প্রভূর কাছে বিনয় ও গোপন ভাবে দুআ প্রার্থনা কর।

(২) اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

দুআ প্রার্থনাকারীর দুআ আমি কবুল করি, যখন আমার কাছে দুআ প্রার্থনা করে।

এ রকম আয়াত সমুহে دُعَا শব্দের অর্থ দুআ প্রার্থনা করা বা পূজা করা বা ডাকা হতে পারে।একই শব্দ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। যদি যথাস্থানে যথার্থ অর্থ করা না হয, তাহলে অনেক সময় কুফরীর আশঙ্কা থাকে । এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে করা হয়েছে।

কায়দা নং ১০ ঃ (ক) যখন (شِرْك) শিরকের দ্বন্দ্ব ঈমানের সাথে হবে, তখন শিরক বলতে কুফর বুঝাবে।

(খ) যখন (شِرْك) শিরকের দ্বন্দ্ব আমলের সাথে হবে, তখন শিরক বলতে কুফর বুঝাবে না বরং মুশরিকদের মত কাজ করা বুঝাবে।

(ক) এর উদাহরণ ঃ

(১) وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِك

মুমিন গোলাম মুশরিক তথা কাফির থেকে উত্তম।

(২) وَلَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا

ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন মুশরিক তথা কাফিরকে বিবাহ কর না।

(৩) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিক তথা কাফিরকে ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন।

এ সব আয়াতে শিরক দ্বারা কুফর বুঝানো হয়েছে। কেননা মুমিন মহিলাকে কোন কাফির পুরুষের বিবাহ জায়েয নেই। কুফরী অবস্থায় কোন মানুষ মারা গেলে, ক্ষমা করা হবে না। মুমিন যে কোন কাফির থেকে উত্তম। এখানে শিরক অর্থ যদি মুর্তি পূজা করা হয়, তাহলে ভুল হবে।

(খ) এর উদাহরণ ঃ

(১) اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَاتَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।

হাদীছ শরীফে বর্নিত আছে- مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

যে ইচ্ছাকৃত ভাবে নামায ত্যাগ করলো, সে কুফরী করলো।

এ আয়াত ও হাদীছ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে নামায না পড়া মুশরিক, কাফিরদের কাজের মত। কেননা নামায না পড়া গুনাহ বটে, তবে কুফর বা শিরক নয়।

কায়দা নং ১১ ঃ (ক) যখন صَلٰوة শব্দের পর عَلٰى অব্যয় থাকে তখন صَلٰوة এর অর্থ হবে রহমত বা দুআয়ে রহমত বা জানাযার নামায।

(খ) যখন صَلٰوة শব্দের পর عَلٰى অব্যয় থাকে না, তখন صَلٰوة এর অর্থ হবে নামায।

(ক) এর উদাহরণ ঃ

(১) هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ

তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের উপর রহমত করেন এবং তাঁরই ফিরিশতাগন দুআয়ে রহমত করেন।

(২) وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

আপনি ওদের জন্য দুআ করুন। আপনার দুআ হচ্ছে ওদের মনের সান্তনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩) وَلَاتُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَاتَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

সে সব মুনাফিকদের কারো জানাযার নামায পড়বেন না, তাদের কবরের কাছে দাঁড়াবেন না।

(৪) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ

নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগন নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন।

এ রকম আয়াত সমূহে صَلٰوة বলতে দুআ বা রহমত বা নামাযে জানাযাই বুঝাবে। কেননা এ ধরনের আয়াত সমূহে صَلٰوة শব্দের পর عَلٰى আছে।

(খ) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও।

(২) اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا

নিশ্চয় যথাসময় নামায আদায় মুসলমানদের উপর ওয়াজিব।

এ ধরনের আয়াতে صَلٰوة দ্বারা নামায বুঝানো হয়েছে। কেননা এখানে صَلٰوة শব্দের সাথে عَلٰى অব্যয়ের কোন সম্পর্ক নেই। উল্লেখিত দ্বিতীয় আয়াতে صَلٰوة এর পর যদিওবা عَلٰى আছে কিন্তু এ عَلٰى অব্যয়ের সম্পর্ক كِتَابًا শব্দের সাথে, صَلٰوة শব্দের সাথে নয়। তাই এখানেও صَلٰوة অর্থ নামায হবে।

কায়দা নং ১২ ঃ কুরআন শরীফে যখন মৃত, অন্ধ, বধির, বোবা, কবরবাসী- এসব শব্দের সাথে ফিরে না আসা, হেদায়ত না পাওয়া, না শুনা ইত্যাদি শব্দ থাকবে, তখন ওসব শব্দের অর্থ সত্যিকার মৃত, অন্ধ ইত্যাদি হবেনা বরং এসব শব্দের ভাবার্থ হবে কাফির অর্থাৎ অন্তরের দিক দিয়ে মৃত, অন্ধ ইত্যাদি। ওদের না শুনার অর্থ হবে হেদায়েত না পাওয়া, বাস্তবে না শুনা নয়। ওসব আয়াতের ভাবার্থ হবে-আপনি ওসব অন্তরের দিক দিয়ে মৃত, অন্ধ বধির কাফিরদেরকে কিছু শুনায়ে হেদায়াতের পথে আনতে পারবেন না। তবে ওসব আয়াতের ভাবার্থ এটা নয় যে তিনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না। যেমন ঃ

(১) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَايَرْجِعُوْنَ

এসব কাফির বধির, বোবা, অন্ধ, তাই ওরা ফিরবে না।

(২) اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ

আপনি ওসব মৃতদেরকে এবং বধিরদেরকে (কাফিরদেরকে) শুনাতে পারবেন না।

(৩) وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا

যে এ দুনিয়াতে অন্ধ সে আখেরাতেও অন্ধ এবং সে পথভ্রষ্ট।

এ রকম আয়াত কুরআন শরীফের অনেক জায়গায় আছে এবং এসব জায়গায় মৃত অন্ধ, বধির অর্থ বাস্তব মৃত, অন্ধ বা বধির হবে না বরং এ সবের ভাবার্থ কাফিরই হবে। নিম্নের আয়াত গুলো ওসর আয়াতের ব্যাখ্যা করে দিয়েছে।

(১) اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَاتُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ- وَمَا اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ

নিশ্চয়ই আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না এবং শুনাতে পারবেন বধিরদেরকে যখন ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং না অন্ধদেরকে ওদের গোমরাহী থেকে ফিরায়ে আনতে পারতেন। তবে যারা আমার আয়াত সমূহের উপর ঈমান রাখে, তাদেরকে শুনাতে পারবেন এবং তারা মুসলমান।

এ আয়াতে মৃত, অন্ধ বধিরের তুলনা মুমিনের সাথে করা হয়েছে, যদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে মৃতদের দ্বারা কাফির বুঝানো হয়েছে।

(২) وَالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ

যারা ঈমান আনেনি, তাদের কান বধির এবং তাঁরা এ ব্যাপারে অন্ধ, যেন তাদেরকে দুরবর্তী স্থান থেকে ডাকা হচ্ছে।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে কাফিরেরা অন্ধ, বধিরের মত।

(৩) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ

এরা সেই কাফির, যাদের উপর আল্লাহ লানত করেছেন। অতপর ওদেরকে বধির করে দিয়েছেন এবং ওদের চোখগুলোকে অন্ধ করে দিয়েছেন।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে লানত দ্বারা মানুষ অন্ধ বধির হয়ে যায় অর্থাৎ মন অন্ধ ও বধির হয়ে যায়।

(৪) وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে নবীগনকে আমি আপনার আগে পাঠিয়েছি, ওদের কাছে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ বানিয়েছি, যার পূজা করা যায়।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগন ওফাতের পর শুনেন এবং জবাবও দেন। যদি পুর্বের ওফাত প্রাপ্ত নবীগন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কথা না শুনতেন বা জবাব না দিতেন, তাহলে ওনাদের কাছে জিজ্ঞেস করার কি অর্থ হতে পারে। মৃতদের শ্রবন শক্তি সম্পর্কে আরও অনেক আয়াত আছে। প্রথম অধ্যায়ে দুআর আলোচনায়ও কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াত গুলো বলে দিয়েছেন যে যেখানে মৃতদের শ্রবন শক্তির কথা অস্বীকার করা হয়েছে, ওখানে মৃতদের বলতে কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতগুলো দ্বারা মৃতদের না শুনাটা প্রমান করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। এ রকম হলেতো নামাযের তাশাহুদে হুযুরকে সালাম এবং কবরস্থানে মৃতদেরকে সালাম করার নির্দেশ দেয়া হতো না। কেননা যারা শুনে না, ওদেরকে সালাম করা নিষেধ। এজন্য নিদ্রারত ব্যক্তিকে সালাম করা যায় না।

কায়দা নং ১৩ ঃ যখন মুমিনকে ঈমানের বা নবীকে তকওয়ার কথা বলা হয়, তখন এর দ্বারা ঈমান ও তকওয়ার উপর অটল থাকাটা বুঝতে হবে। কেননা ওনাদের মধ্যে ঈমান ও তকওয়াতো আগে থেকেই মওজুদ আছে। যেমন-

(১) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا

হে ঈমানদারগণ ঈমান আন। অর্থাৎ ঈমানের উপর অটল থেকো।

(২) يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ

হে নবী, আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করার উপর অটল থেকো।

(৩) اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও রসূলের উপর ঈমান আন, অর্থাৎ ঈমানের উপর অটল থেকো।

এ রকম সমস্ত আয়াতে ঈমান ও তকুওয়া বলতে ঈমান ও তকৃওয়ার উপর অটল থাকাটাই বুঝতে হবে, যাতে তরজুমা সঠিক হয়। তাছাড়া মুসলমানদেরকে হুকুমাদি দেয়া হয় পালন করার জন্য এবং নবীকে হুকুমাদি এ জন্য দেয়া হয় যেন সেগুলো পালন করানো হয়। যেমন জাহাজের যাত্রিগন গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য জাহাজে আরোহন করে থাকে এবং জাহাজের চালক যাত্রিদেরকে গন্তব্যস্থলে পৌছানোর জন্য জাহাজে আরোহন

করে থাকে। যাত্রি ভাড়া দিয়ে এবং চালক বেতন নিয়ে জাহাজে আরোহন করে।

কায়দা নং ১৪ ঃ (ক) যখন خَلَقَ শব্দের ইঙ্গিত আল্লাহর দিকে হয়, তখন এর অর্থ হবে সৃষ্টি করা অর্থাৎ অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ববান করা।

(খ) যখন خَلَقَ শব্দের ইঙ্গিত বান্দার দিকে হয়, তখন এর অর্থ হবে তৈরী করা বা গড়া।

(ক) এর উদাহরণ নং ঃ

(১) خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

আল্লাহ তাআলা জীবন মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যেন তোমাদেরকে যাচাই করে, কে নেক আমলকারী।

(২) وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেক কিছু জ্ঞাত।

(৩) خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এবং যারা তোমাদের আগের, তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

এ ধরনের সমস্ত আয়াতে خلق এর অর্থ সৃষ্টি করা। কেননা এর কর্তা হলেন আল্লাহ।

(খ) এর উদাহরণ ঃ-

(১) اِنِّيْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করতেছি।

(২) اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا

তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মুর্তিদের পুজা কর এবং মিথ্যা অজুহাত তৈরী কর।

(৩) فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

অতএব বড় করুনাময় আল্লাহ সর্বোত্তম তৈরীকারক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কায়দা নং ১৫ ঃ (ক) যখন হুকুম, সাক্ষ্য, ওকালত, হিসেব, মালিকানার ইঙ্গিত আল্লাহর দিকে করা হয়, তখন ওসবের প্রকৃত অর্থ বুঝাবে। অর্থাৎ স্বত্বাগত ও স্থায়ী মালিক ইত্যাদি।

(খ) যখন ওসবের ইঙ্গিত বান্দার দিকে করা হবে, তখন ও সবের আসল অর্থ হবেনা। বরং ক্ষনস্থায়ী, প্রদত্ত ও রূপক অর্থে মালিক উকীল ইত্যাদি বুঝাবে।

(ক) এর উদাহরন ঃ

(১) اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ

হুকুম করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

(২) وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

আল্লাহই যথেষ্ট সাক্ষী।

(৩) اَنْ لَّاتَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ وَكِيْلًا

আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উকীল কর না।

(৪) وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا

আপনার প্রভু যথেষ্ট উকীল।

(৫) وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا

আমি আপনাকে কাফিরদের প্রতি উকীল করে প্রেরন করিনি।

(৬) وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ

আপনি ওসব কাফিরদের উকীল নন।

(৭) وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

হিসেব গ্রহনকারী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট।

(৮) وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

আসমান জমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর মালিকাধীন।

(৯) وَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا

আল্লাহকেই উকীল বানাও।

এরকম সমস্ত আয়াতে প্রকৃত মালিক, প্রকৃত উকিল, প্রকৃত সাক্ষী, প্রকৃত হিসেব

গ্রহণকারী বুঝানো হয়েছে । অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত মালিক, উকীল সাক্ষী ও হিসেব গ্রহনকারী কেউ নেই।

(খ) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের আশংকা কর, তাহলে একজন স্বামীর পক্ষের এবং একজন স্ত্রীর পক্ষের সালিশকার পাঠাও।

(২) وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

যখন তোমরা মানুষের উপর হুকুম কর, তখন ইনসাফের সাথে কর।

(৩) فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

অতএব আপনার প্রভূর কসম, এ সব লোকেরা মুমিন বলে গন্য হবে না, যতক্ষন না আপনাকে তাদের বিবাদে বিচারক মনে করে।

(৪) وَلَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ

একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ কর না এবং বিচারকদের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে যেও না।

(৫) وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ

নিজেদের মধ্যে থেকে দুজন পরহিজগারকে সাক্ষী কর।

(৬) وَكَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

আজ তুমি নিজের হিসেব নেয়ার জন্য নিজেই যথেষ্ট।

(৭) وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

যে সব মহিলার তুমি মালিক, ওগুলো ছাড়া স্বামীওয়ালী মহিলাগণ তোমার জন্য হারাম।

(৮) وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ

তোমাদের পুরুষদের থেকে দুজন সাক্ষী করে নাও।

(৯) شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অছিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্যে হতে দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তোমাদের পরস্পরের সাক্ষী।

এ রকম সমস্ত আয়াতে ক্ষনস্থায়ী, নিয়ন্ত্রিত ও প্রদত্ত মালিকানা, সাক্ষ্য, ওকালত, হুকুমত, হিসেব গ্রহণ ইত্যাদি বান্দাদের জন্য প্রমানিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাগন রূপক অর্থে বিচারক, উকীল ও সাক্ষী। সুতরাং উভয় প্রকারের আয়াতের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। যেমন শ্রবন, দর্শন জীবিত ইত্যাদি আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (আল্লাহ তাআলাই শ্রবণকারী, দর্শনকারী।) আবার এগুলো বান্দাদেরও বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (আমি মানুষকে শ্রবণকারী, দর্শনকারী করে দিয়েছি।) আল্লাহর শুনা ও দেখা স্থায়ী, অনিয়ন্ত্রিত, স্বত্ত্বাগত আর বান্দাদের দেখা ও শুনা.জীবিত থাকা অস্থায়ী, নিয়ন্ত্রিত ও প্রদত্ত। এ জন্য আল্লাহর নামও আলী যেমন وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ এবং হযরত শেরে খোদার নামও আলী। মাওলানা শব্দটি আল্লাহ তাআলার বিশেষন যেমন اَنْتَ مَوْلٰنَا আবার আলেমদেরকেও মাওলানা বলা হয়। তবে আল্লাহ ও বান্দার আলী ও মওলা হওয়ার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন।

কায়দা নং ১৬ ঃ (ক) যেখানে অদৃশ্য জ্ঞানকে কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা হয় বা তাঁর বান্দাদের জন্য অস্বীকার করা হয়, সেখানে সেই অদৃশ্য জ্ঞান দ্বারা স্বত্ত্বাগত, স্থায়ী ও সমস্ত অদৃশ্য জ্ঞানকে বুঝাবে।

(খ) যেখানে অদৃশ্য জ্ঞান বান্দাদের জন্য প্রমানিত হয় বা কোন নবীর উক্তি কুরআনে এভাবে উদ্ধৃত করা হয় যে অমুক নবী বলেছেন আমি গায়ের জানি, সেখানে রূপক, ক্ষনস্থায়ী প্রদত্ত গায়েবী জ্ঞান বুঝাবে। যেমন ১৫ নং কায়দায় অন্যান্য গুনাবনী প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) قُلْ لَايَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰه

আপনি বলে দিন, আসমান জমীনে গায়েব আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

(২) وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّاهُوَ

তাঁর প্রভূর কাছে গায়েবের চাবি আছে, যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

(৩) اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ

কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ তাআলার কাছেই আছে।

(৪) وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ

কোন ব্যক্তি জানেনা যে কাল কি অর্জন করবে এবং কোন ব্যক্তি জানেনা যে কোন্ জায়গায় মৃত্যুবরণ করবে।

(৫) وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ

আমি যদি গায়ের জানতাম, তাহলে অনেক মঙ্গল সঞ্চয় করে নিতাম।

এ রকম সমস্ত আয়াতে ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান বলতে স্বত্ত্বাগত, স্থায়ী বা অনিয়ন্ত্রীত অদৃশ্য জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। এধরণের জ্ঞান বান্দাদের মধ্যে নেই।

(খ) এর উদাহরণ ঃ

(১) هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

কুরআন ওসব পরহিজগারদের জন্য পথ-প্রদর্শক যারা গায়েবের উপর ঈমান আনে। (উল্লেখ্য যে গায়েবের উপর ঈমানতো জেনেই আনা হবে।)

(২) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَايُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

আল্লাহ অদৃশ্য জ্ঞানী। তাঁর পছন্দনীয় রসুল ছাড়া তাঁর অদৃশ্য জ্ঞানের ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না।

(৩) وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

আপনাকে যেটা জানায়ে দিয়েছেন, যেটা আপনি জানতেন না এবং আপনার উপর আল্লাহর বড় মেহেরবানী।

(৪) وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ

হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) বলেছেন, যা তোমরা জান না, সেটা আমি আল্লাহর তরফ থেকে জানি।

(৫) وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ

আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, যা তোমরা ঘরে খাও এবং জমা কর।

(৬) قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهٖ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

يَاتِيكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ

হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন, যে খাবার তোমরা খাও, সেটা তোমাদের কাছে আসবেনা। আমি এর রহস্য তোমাদেরকে বলে দিব সেটা আসার আগে। এটা সেই জ্ঞানের দ্বারা, যা আমার প্রভূ আমাকে শিখায়েছেন।

(৭) وَمَاهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنَ

সেই নবী গায়েব বলার ব্যাপারে কার্পন্য করেন না।

এ রকম সমস্ত আয়াতে ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান বলতে প্রদত্ত, ক্ষনস্থায়ী নিয়ন্ত্রিত অদৃশ্য জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। কেননা স্বয়ং মানুষ যেহেতু নিয়ন্ত্রিত, ক্ষনস্থায়ী, যেহেতু ওর সমস্ত গুনাবলীও নিয়ন্ত্রত, ক্ষনস্থায়ী হবে।

কায়দা নং ১৭ ঃ (ক) যে সব আয়াতে সুপারিশ করাকে অস্বীকার করা হয়েছে, ওখানে জোর পুর্বক সুপারিশ বা কাফিরদের জন্য সুপারিশ বা মুর্তিদের সুপারিশ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সামনে কেউ জোর পুর্বক সুপারিশ করতে পারেনা বা কাফিরদের জন্য কোন সুপারিশ নেই বা মুর্তি সুপারিশকারী নয়।

(খ) কুরআন শরীফের যেখানে সুপারিশ প্রমানিত আছে, ওখানে মুমিনদের জন্য আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সুপারিশ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগন আল্লাহর অনুমতিক্রমে মুমিনদের জন্য সুপারিশ করে ক্ষমা করায়ে নিবেন।

(ক) এর উদাহরণ ঃ

(১) يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيْهِ وَلَاخُلَّةٌ وَّلَاشَفَاعَةٌ

সেই কিয়ামতের দিন যেখানে না আছে বেচা কেনা, না আছে বন্ধুত্ব, না আছে সুপারিশ।

(২) وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّاتَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَايُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَاتَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَاهُمْ يُنْصَرُوْنَ

সেই দিনের ভয় কর, যেদিন না হবে কেউ কারো বদলা, না কিছু নিয়ে ছেড়ে দেবে, না কোন সুপারিশে উপকার হবে, না ওদের সাহায্য হবে।

(৩) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ

সুপারিশকারীর সুপারিশ ওদের কোন উপকার হবে না।

(৪) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ

কাফিরেরা কি আল্লাহর মুকাবিলায় সুপারিশকারী ঠিক করে রেখেছে?

(৫) وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ

যালিমদের নাই কোন বন্ধু, নাই কোন সুপারিশকারী, যার কথা গ্রহন করা যায়।

(৬) وَلَايَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

সুপারিশকরার কারো অধিকার নেই, কেবল ওদের যারা সত্যের সাক্ষ্য দেয় এবং জ্ঞান রাখে।

(৭) وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَاشَفِيْعٍ

যালিমদের না কোন বন্ধু আছে, না কোন সুপারিশকারী।

এ ধরনের সমস্ত আয়াতে কাফিরদের সুপারিশ, মুতিদের সুপারিশ জোর পুর্বক সুপারিশের অস্বীকার করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোর সাথে নবী ওলী বা মুমিনগণের সুপারিশের কোন সম্পর্ক নেই।

(খ) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

আপনি তাদেরকে দুআ করুন । নিশ্চয়ই আপনার দুআ ওদের জন্য শান্তনাদায়ক।

(২) مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّابِاِذْنِهِ

সে কে, যে আল্লাহর কাছে তাঁর বিনা অনুমতিতে সুপারিশ করে।

(৩) لَايَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا

এ সব লোক সুপারিশের অধিকারী নয়। কিন্তু যারা আল্লাহর কাছে ওয়াদাবদ্ধ।

(৪) وَلَايَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى

ওনারা সুপারিশ করবেন না, কেবল ওদের যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট (মুমিনগণ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) لَاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلًا

সুপারিশ কোন উপকার দিবে না। কিন্তু ওদের (উপকার হবে) যাদের জন্য আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন। ওনার কথাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট।

এ রকম অনেক আয়াতে মুসলমানদের জন্য সুপারিশের কথা বলা হয়েছে যাদের সুপারিশ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগন করবেন। এ অর্থে আয়াতে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ যে হাদীছে বর্নিত আছে যে সুন্নত ত্যাগকারী শাফায়াত থেকে বঞ্চিত, সেটার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধির সুপারিশ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ওর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে না। কেননা অন্য রেওয়ায়েতে বনিত আছে যে কবিরা গুনাহকারীদের জন্য সুপারিশ আছে। অর্থাৎ ক্ষমা করার সুপারিশ। অধিকন্তু অনেক রেওয়ায়েতে আছে যে যাকাত অনাদায়কারীরা নিজেদের পশু ও মাল কাঁধের উপর নিয়ে নবীর দরবারে হাজির হবে এবং সুপারিশের আবেদন করবে, কিন্তু তাঁকে সুপারিশ করা থেকে বারন করা হবে। এখানে ওসব লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা যাকাতের অস্বীকার করে কাফির হয়ে গিয়েছিল, এবং কাফিরদের জন্য কোন সুপারিশ নেই। যেমন ছিদ্দিকে আকবরের খেলাফত কালে কতেক লোক যাকাতের অস্বীকারকারী হয়েছিল। অথবা উপরোক্ত হাদীছে সুপারিশ না করাটাই বুঝানো হয়েছে, করতে পারবে না, তা নয়। এ বিষয়টা একান্ত স্মরন রাখা দরকার। অনেকেই এখানে ধোঁকা খায়।

কায়দা নং ১৮ ঃ- (ক) যে সব আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহবান করা নিষেধ করা হয়েছে বা আহবানকারীদের পাপের কথা বর্ণিত আছে, যে সব আয়াতে এ আহবান দ্বারা মাবুদ মনে করে আহবান করা অর্থাৎ পূজা করা বুঝানো হয়েছে।

(খ) যে সব আয়াতে খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে আহবান করার নির্দেশ আছে বা এ আহবান দ্বারা অসন্তষ্টি প্রকাশ না পায়, সে সব আয়াতে আহবান দ্বারা ডাকাই বুঝানো হয়েছে।

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

ওর থেকে বড় গোমরাহ কে আছে, যে খোদা ভিন্ন অন্য কারো পূজা করে।

(২) لَاتَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

আল্লাহর সাথে অন্য কারো পুজা কর না।

এ রকম শত শত আয়াতে دُعَا শব্দের অর্থ পূজা করা অর্থাৎ মাবুদ মনে করে আহবান করা, কেবল আহবান করা নয়।

(খ) এর উদাহরন ঃ-

(১) وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আল্লাহ ছাড়া যাকে তোমরা ক্ষমতাবান মনে কর, ডেকে নাও।

(২) اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۤئِهِمْ

ওদের বাপদাদাদের নাম নিয়ে ডাক।

এ রকম আয়াত সমুহে دُعَا শব্দের অর্থ ডাকা বা আহবান করা। এর বিস্তারিত বর্ননা প্রথম অধ্যায়ের دَعَا শব্দের আলোচনায় করা হয়েছে।

কায়দা নং ১৯ ঃ (ক) যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্যকারী বানানো থেকে নিষেধ করা হয়, বা সাহায্যকারী মান্যকারীদের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়, বা ভর্ৎসনা করা হয় বা এদেরকে মুশরিক কাফির বলা হয়, তখন সাহায্যকারী বলতে মাবুদ বা আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্য কারী বুঝাবে। অথবা আয়াতের ভাবার্থ এটাই হবে যে কিয়ামতের দিন কাফিরদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(খ) যখন খোদা ভিন্ন অন্যদেরকে সাহায্যকারী গ্রহন করতে নির্দেশ দেয়া হয় বা এর জন্য অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা না হয়, তখন সাহায্যকারী বলতে বন্ধু, আল্লাহর অনুমতিতে সাহায্যকারী বা নৈকট্যলাভকারী কাউকে বুঝাবে।

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَالظّٰلِمُوْنَ مَالَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَانَصِيْرٍ

যালিমদের কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই।

(২) وَمَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَانَصِيْرٍ

আল্লাহর মুকাবিলায় তোমাদের কোন বন্ধু এবং সাহায্যকারী নেই।

এ রকম অনেক আয়াতে আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী বুঝানো হয়েছে। এ রকম সাহায্যকারী গ্রহন করা কুফরী।

(খ) এর উদাহরণঃ-

(১) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ

তোমাদের সাহায্যকারী হচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর রসুল এবং সে সব মুসলমান, যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং আল্লাহর সামনে নত হয়ে আছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

হে আল্লাহ, আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে বন্ধু মনোনিত করুণ এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী ঠিক করে দিন।

এ রকম অগনিত আয়াতে আল্লাহর অনুমতিতে সাহায্যকারী বুঝানো হয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ননা প্রথম অধ্যায়ে وَلِيْ (সাহায্যকারী) শব্দের আলোচনায় করা হয়েছে।

কায়দা নং ২০ ঃ (ক) যেখানে উসীলার অস্বীকৃতি রয়েছে, সেখানে মৃতদের উসীলা বা কাফিরদের জন্য উসীলা বুঝানো হয়েছে বা সেই উসীলা বুঝানো হয়েছে, যার পূজা পাঠ করা হয়।

(খ) যেখানে উসীলা প্রমানিত আছে, ওখানে আল্লাহর প্রিয়জনদের উসীলা বা মুমিনদের জন্য উসীলা বুঝানো হয়েছে। এভাবে অর্থ করা হলে আয়াতসমূহে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকে না।

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

আমরা ওসব মুর্তিদের পূজা শুধু এ জন্যই করি যেন এগুলো আমাদেরকে আল্লাহর সন্নিকট করে দেয়।

এতে বুঝা গেল যে আরবের মুশরিকরা তাদের মুর্তিগুলোকে, যেগুলো খোদার দুশমন, খোদার সান্নিধ্য লাভের উসীলা মনে করে পূজা করতো, ওদের মুশরিক হওয়ার দুটি কারণ রয়েছে- এক, খোদার দুশমনকে খোদা পর্যন্ত পৌছাঁর উসীলা মনে করা, দুই, ওগুলোর পূজা করা। কেবল উসীলা গ্রহন করার কারণে তারা মুশরিক হয়নি।

(খ) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

সেই রবের দিকের উসীলা তালাশ কর।

(২) وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

যদি এসব লোক নিজেদের উপর জুলুম করে আপনার বারগাহে হাজির হয়, অতপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসুলও তাদের জন্য মাগফেরাতের দুআ করেন, তাহলে আল্লাহকে মহা দয়াবান তওবা গ্রহনকারী হিসেবে পাবে।

(৩) وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

সেই রসুল ওদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিখান।

(৪) قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ

বলে দিন, তোমাদেরকে মৃত্যুর ফিরিশতা মৃত্যু দান করে, যাকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে।

এ ধরনের সমস্ত আয়াতে উসীলার প্রমাণ রয়েছে। তবে সেই উসীলা, যেটা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রিয় বান্দগণ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাঁয়ে দেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামে উসীলা খুবই গুরুত্বপূর্ন বিষয়। কেননা সমস্ত কাজ মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় কিন্তু মৃত্যু, কবর, হাশর প্রত্যেক জায়গায় উসীলা গ্রহন একান্ত প্রয়োজন যেন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নামে মৃত্যু হয়, কবরে যেন তাঁরই নামে কামিয়াব হাসিল হয় এবং হাশরে তাঁরই উসীলায় যেন নাজাত মিলে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য মখলুককে বিভিন্ন অনুশাসন পালন করতে হয় না। কিন্তু প্রত্যেক মখলুকের উসীলা প্রয়োজন। দেখুন, কাবা মুয়াজ্জমা হুযুরের উসীলা ছাড়া কেবলা হয়নি এবং কাবা শরীফ হুযুরের হস্তক্ষেপ ছাড়া মূর্তিদের নোংরা পরিবেশ থেকে পবিত্র হতে পারেনি। তাই উসীলার অস্বীকার করা মানে ইসলামের একটি খুবই গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়কে অস্বীকার করা বুঝায়।

কায়দা নং ২১ ঃ (ক) যে সব আয়াতে বলা হয়েছে যে কেবল নিজের আমলই মানুষের কাজে আসবে বা যে সব আয়াতে বলা হয়েছে যে মানুষ যা নিজে করে, সেটারই প্রতিফল পাবে, এর দ্বারা শারীরিক ফরয ইবাদত সমূহ বুঝানো হয়েছে বা ওসব আয়াতের ভাবার্থ এটাই হবে যে মানুষের জন্য নিজের আমলসমূহ হবেই নির্ভরযোগ্য। কারো প্রেরিত ছওয়াবের কোন নিশ্চয়তা নেই।

(খ) যে সব আয়াতে বলা হয়েছে যে অন্যদের নেকী নিজের কাজে আসে, এর দ্বারা আমল সমুহের ছওয়াব, বা মসীবত দূর হওয়া বা মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়া বুঝানো হয়েছে।

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

মানুষের জন্য অন্য কিছু নেই কিন্তু সে যে কর্ম করে (সেটার প্রতিফল)

(২) لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

নিজের জন্য উপকারী সেই আমল, যা নিজে করে। আর নিজের জন্য ক্ষতিকর সেই গুনাহ, যা নিজে করে।

এ আয়াতদ্বয়ের ভাবার্থ হচ্ছে, কেউ কারো পক্ষে ফরয নামায পড়তে পাবে না, ফরয রোযা রাখতে পারে না। এ জন্য ওসব আয়াতে চেষ্টা ও অর্জনের কথা বর্ণিত হয়েছে বা আয়াতের অভিপ্রায় এটাই যে নিজে যা করে সেটাই হচ্ছে নিজের মূলধন। অন্যদের ঈছালে ছওয়াবের কোন নিশ্চয়তা নেই। পরের উপর আশা করে অলস বসে থাকা বোকামী মাত্র ।

(খ) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا

হযরত খিজির বললেন, সেই দেয়ালের নীচে দু'ইয়াতীম শিশুর ধনভান্ডার রয়েছে এবং ওদের পিতা ছিলেন নেককার। অতএব তোমার প্রভূ চাইলো যে এরা প্রাপ্ত বয়স্ক হোক। তখন তারা নিজেদের ধনভান্ডার নিজেরা বের করে নিবে।

(২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

যারা ঈমান এনেছে এবং ওদের সন্তানেরা ঈমানের সাথে ওদের অনুসরণ করেছে, আমি ওদের সন্তানদেরকে ওদের সাথে মিলায়ে দিয়েছি এবং ওদের আমলের মধ্যে কোন কম্‌তি করিনি।

প্রথম আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে পড়ন্ত দেয়ালকে হযরত খিজির ও হযরত মুসা (আলাইহিমাস সালাম) কর্তৃক পূ:স্থাপন করে দেয়ার একমাত্র কারণ এটাই ছিল যে এর নীচে ধন ভান্ডার ছিল, যার মালিক ছিল এক নেক্‌কার বান্দা। ওনার দুটি শিশু ছিল। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল দেয়ালটা যেন খাঁড়া থাকে এবং ধন ভান্ডারটা নিরাপদ থাকে, যাতে শিশুদ্বয় বড় হয়ে তা গ্রহন করতে পারে। এ জন্য সেই দেয়ালটা মেরামত করার জন্য দুজন নবীকে পাঠিয়ে ছিলেন। সেই ইয়াতীম শিশুদ্বয়ের প্রতি এ মেহেরবানী ওদের পিতার নেকীর কারনে করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে নেককারদের ঈমানদার সন্তানগণ জান্নাতে তাদের মা বাপের সাথে থাকবে, যদিওরা তাদের আমলসমূহের পদমর্যাদা পিতার চেয়ে কম হয়। এ রকম নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নাবালক শিশু হযরত তৈয়র, তাহেব, কাসেম, ইব্রাহীম জান্নাতে হুযুরের সাথে থাকবেন। অথচ ওনারা কোন নেকী করেননি। এতে বুঝা গেল একের নেকী অপরের কাজে আসে। এ জন্য ঈছালে ছওয়ার, ফাতেহা ইত্যাদি করা হয়। বরং বদলী হজ্ব ও অন্যজনের পক্ষ থেকে কর যায়। যাকারের ব্যাপারেও অন্য জনের জিম্মাদার হওয়া যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কায়দা নং ২২ ঃ (ক) যে সব আয়াতে বলা হয়েছে যে কিয়ামতের দিন কেউ কারো বোঝা উঠাবে না, এর ভাবার্থ হচ্ছে সানন্দে উঠাবেনা বা এ রকম উঠাবে না, যার ফলে অপরাধী মুক্তি পেয়ে যাবে।

(খ) যে সব আয়াতে বলা হয়েছে যে কতেক লোক কতেক লোকের বোঝা উঠাবে, এর ভাবার্থ হচ্ছে বাধ্য হয়ে উঠাবে বা কেউ উঠাবে গুনাহ করানোর কারণে এবং কেউ উঠাবে গুনাহ করার কারণে।

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

কোন ব্যক্তি নিজ দায়িত্ব ছাড়া উপার্জন করবে না এবং কেউ অপরের বোঝা উঠাবে না।

(২) اِنْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا

তোমরা যদি ভাল কাজ কর, তা নিজেদের জন্য করবে এবং যদি মন্দ কাজ কর, তাও নিজেদের জন্য।

(৩) فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

যে ব্যক্তি সৎ পথে আসলো, সে নিজেরই মঙ্গলের পথে আসলো এবং যে বিপথগামী হলো, সে নিজেকেই বিপথগামী করলো।

(৪) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ-

কাফিরেরা মুসলমানদেরকে বললো, আমাদের পথে চল এবং আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করবো অথচ ওরা নিজেদের পাপে নিমর্জিত। তারা কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয় ওরা মিথ্যুক।

(৫) لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

ওদের জন্য সেটাই, যা ওরা নিজেরা অর্জন করেছে। তোমাদের জন্য হলো তোমাদের অর্জন। তোমাদেরকে ওদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

এ সমস্ত আয়াত থেকে বুঝা গেল যে কেউকে অন্যজনের কারনে দোষী সাব্যস্ত করা হবে না এবং কেউ কারো গুনাহের বোঝা উঠাবে না এবং ছওয়াবেরও ভাগী হবে না

pdf By Syed Mostafa Sakib

বরং নিজের কাজের কর্মফল নিজেই ভোগ করবে।

(খ) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُوْنَ

নিশ্চয় তারা নিজেদের বোঝা উঠাবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে অন্যদের বোঝাও। এবং যে সব মিত্যা অপবাদ দিত, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন জিজ্ঞসা করা হবে।

(২) يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

হে ঈমানদারগণ, নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যেটার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।

(৩) وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَّاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

সেই ফিত্নাকে ভর কর, যেটা শুধু তোমাদের মধ্যে যারা জালিম তাদেরকে আক্রান্ত করবে না। জেনে রেখ, আল্লাহ তাআলা কঠিন শাস্তিদাতা।

(৪) وَلَا تَكُوْنُوْا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ

তোমরা কুরআনের প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না।

এসব আয়াত থেকে বুঝা গেল যে কিয়ামতের দিন কোন কোন গুনাহগার অপর গুনাহগারদের বোঝা উঠাবে। এটাও জানা গেল যে কারো কারো গুনাহের কারনে দুনিয়াতেও অন্যদের উপর মসীবত আসে। এটাও প্রমানিত হলো যে নিজের নাজাতের জন্য পরিবার পরিজনকেও হেদায়ত করা প্রয়োজন।

এ দু'ধরনের আয়াতের সমন্বয় সে ভাবে করা হবে, যা আমি এ কায়দার প্রারম্ভে বলেছি যে আনন্দে কেউ কারো বোঝা উঠাবেনা। এবং কেউ অন্যের বোঝা এরকম উঠাবেনা, যার ফলে অপরাধী একবারে মুক্তি পেয়ে যায়। তবে এটা একান্ত স্মরন রাখা দরকার যে পথভ্রষ্টকর বিষয় সমূহের প্রবর্তককে সমস্ত বিপথগামীদের বোঝা উঠাতে হবে।

কায়দা নং ২৩ ঃ (ক) যে সব আয়াতে বলা হয়েছে যে 'রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য কর না', ওখানে ঈমানে পার্থক্য করাটা বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ এ রকম পার্থক্য কর না

যে কাউকে মান্য করা হয় এবং কাউকে অমান্য করা হয়'। বা এটা বুঝানো হয়েছে যে নিজের পক্ষ থেকে পার্থক্য কর না অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে ওনাদের ফযীলতের মধ্যে তারতম্য কর না বা এ রকম পার্থক্য কর না যার ফলে কতেক নবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়।

(খ) যে সব আয়াতে বলা হয়েছে যে নবীগণের মধ্যে পার্থক্য আছে, ওখানে পদ মর্যাদার পার্থক্য বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ কারো কারো থেকে কারো কারো মর্যাদা উচ্চতর।

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

মুসলমানগণ বলেন, আমরা আল্লাহর রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করি না।

(২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান এনেছে এবং ওসব রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করে না, তাদেরকে আল্লাহ প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।

এ আয়াত সমূহে ঈমানের পাথক্য বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ কতেক নবীকে মানা এবং কতেক নবীকে না মানা কুফরী। সকল নবীকে মান্য করা ঈমানী দ্বায়িত্ব। এর ব্যাখ্যা নিম্নের আয়াতে করা হয়েছে।

(৩) إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا –

নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং বলে যে আমরা কতেককে বিশ্বাস করি এবং কতেককে অস্বীকার করি এবং তারা চায় যে মাঝামাঝি রাস্তা অবলম্বন করতে।

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে ঈমানের ক্ষেত্রে নবীগণের মধ্যে পার্থক্য করা নিষেধ।

(খ) এর উদাহরণ ঃ-

(১) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ রসূলগণের মধ্যে আমি কতেককে কতেকের উপর মর্যাদা দান করেছি । ওনাদের মধ্যে ওরকমও আছেন, যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কতেক ওরকম আছেন যাদের পদমর্যাদা উচ্চ করেছেন।

(২) يايها النبى انا ارسلناك شاهدا ومبشر ونزيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا

হে নবী আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা, ভয় প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে আল্লাহর দিকে আহবান কারী এবং উজ্জল আলোকাবর্তিকা হিসেবে প্রেরন করেছি।

(৩) وما ارسلنك الا رحمة للعلمين

আমি আপনাকে সমস্ত জগতের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।

এ আয়াত সমূহ থেকে বুঝা গেল যে কতেক নবী কতেক থেকে আফজল। বিশেষ করে আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সমস্ত রসূলগণের মধ্যে এ রকম, যেমন তারকারাজির মধ্যে সূর্য এবং সমস্ত জগতের রহমত। এ গুনাবলী অন্যান্য নবীদের মধ্যে নেই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- কোন কোন হাদীছে বনিত আছে-আমাকে ইউনুচ (আলাইহিস সালাম) এর উপরও মর্যাদা দিও না। আবার কোন কোন হাদীছে বনিত আছে-আমি সমস্ত আদম সন্তানের সরদার । এ হাদীছ গুলোর মধ্যে এ ভাবে সমন্বয় করা হয় যে হুযুরের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে অন্য নবীগনের মর্যাদাহানি করা নিষেধ। অন্যান্য নবীগণের মর্যাদা বজায় রেখে হুযুরের শানমান বর্ননা করা জায়েয বরং প্রয়োজন।

কায়দা নং ২৪ ঃ (ক) কুরআন শরীফে যেখানে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দ্বারা এরকম বলানো হয়েছে-আমার এবং তোমাদের সাথে কি আচরন করা হবে, আমার জানা নেই, ওখানে অনুমান করে কিছু জানাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি অনুমান বা ধারনা করে তা জানি না।

(খ) যেখানে জানার কথা বর্ণিত হয়েছে, ওখানে ওহী, ইলহামের সাহায্যে জানাটা বুঝানো হয়েছে।

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وما ادرى ما يفعل بى ولابكم

আমি জানিনা যে আমার সাথে ও তোমদের সাথে কি আচরন করা হবে।

এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে পরকালের বিষয় সমূহ নক্ষত্র দ্বারা অনুমান, বা গননা

করে জানা সম্ভব নয়। আমি নবী হয়েও এবং আমরা প্রজ্ঞা দুনিয়ার সকলের থেকে অধিক হওয়া সত্ত্বেও আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কেননা আমার পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ওসব বিষয় জানার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই অগাধ প্রজ্ঞা দ্বারা আমি যেখানে জানতে পারি না, সেখানে তোমরা কি করে জানতে পারবে। আমি এসব বিষয় ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি। তোমরাতো ওহীর অধিকারী নও।তাই এসব বিষয়ে মাথা ঘামাতে চেষ্টা কর না।

এ আয়াতের তফসীর এ আয়াতের শেষ ভাগে এ ভাবে করা হয়েছে -

ان اتبع الا ما يوحى الى وما انا الا نزير مبين

আমি সেটাই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। এবং আমি সুস্পষ্ট ভাবে সতর্ককারী।

বুঝা গেল যে পরকালের ধরা, মুক্তি ইত্যাদি ওহীর মাধ্যমে জানা গেছে, যা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি নাযিল হয়েছে। এ জন্য এ আয়াতে বিবেক বুদ্ধিকে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার জ্ঞান বিবেক বুদ্ধিলব্ধ নয়, তাঁর জ্ঞান হুজুরী। নিম্নের আয়াত হচ্ছে এর উদাহরন -

وكذالك اوحينا اليك روحا من امرنا ماكنت تدرى ماالكتب ولا الايمان-

এ ভাবে আমি আপনার কাছে আমার ইচ্ছায় এক আত্মিক জিনিস প্রেরন করেছি। এর আগে আপনি না জানতেন কিতাব, না ঈমানের পরিপূর্ণ বিশ্লেষন।

এ আয়াতের ভাবার্থ এটাও হতে পারে যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কুরআন ও ঈমানকে নিজস্ব প্রজ্ঞা চিন্তা ভাবনা বা অনুমান করে জানেননি বরং খোদায়ী ওহীর দ্বারা জেনেছেন। এখানেও বিবেক বুদ্ধি দ্বারা জানাকে অস্বীকার করা হয়েছে, জ্ঞানকে নয়। কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নবুয়াত প্রাপ্তির আগে ইবাদত করতেন, ঈমানের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। ঈসা (আলাইহিস সালাম) মায়ের কোলে তাওহীদ, রেসালত, হুকুমাদি সম্পর্কে অবগত হওয়াটা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে। তিনি জন্মের কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাঁর কউমকে সম্বোধন করে বলেছিলেন-

قال انى عبد الله اتانى الكتب وجعلنى نبيا

তিনি (ঈসা আলাইহিস সালাম) বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা। আমাকে তিনি কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন।

যখন রুহুল্লাহ (ঈসা) আলাইহিস সালাম শৈশবে আল্লাহ থেকে বেখবর নন, তখন

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাবীবুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কি করে বেখবর হতে পারেন। অতএব সেই আয়াতের অর্থ সেটাই হবে, যা আমি উপরে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ অনুমান করে জানাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

(খ) এর উদহরণ ঃ-

(১) لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَّرَ

যেন আল্লাহ তাআলা আপনার উসীলায় আগে পরের গুনাহ ক্ষমা করে।

এখানে গুনাহ বলতে উম্মতের সেই গুনাহ বুঝানো হয়েছে, সেটা ক্ষমা করানোটা হুযুরের জিম্মায় রয়েছে। যেমন উকিল বলে থাকে- আমার মোকাদ্দমায় আমি জয়ী হয়েছি। অর্থাৎ সেই মোকাদ্দমায় যেটা আমার জিম্মাদারীতে আছে। এর অর্থ এ নয় যে আমি এতে অপরাধী ছিলাম। কেননা নবীগণ মাছুম।

(২) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

আমি আপনাকে হাউজে কাউসার দিয়ে দিয়েছি।

(৩) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

আমি আপনার মর্যাদাকে উচ্চ করে দিয়েছি।

এ ধরনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে পরকাল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। তবে সে জ্ঞান ওহীলব্ধ, নিছক বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা অর্জিত নয়। সুতরাং আয়াতের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব রইল না। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বীয় উম্মতের পরিনতি সম্পর্কেও অবহিত আছেন। কুরআন মজীদে হুযুরকে সাক্ষী বলেছেন এবং সাক্ষী সেই হয়ে থাকে, যিনি ঘটনার ব্যাপারে অবগত। এ জন্যইতো তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলতে পেরেছেন-হাসন, হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহুমা) জান্নাতের যুবকদের সরদার, হযরত আবুবকর ছিদ্দিক, ফাতেমাতুজ জোহরা জান্নাতী -

কায়দা নং ২৫ ঃ- (ক) যে সব আয়াতে বলা হয়েছে-নবী হেদায়েত করে না, ওখানে আল্লাহর মর্জির বিপরীত তাঁর মুকাবিলায় হেদায়েত করাটা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ যদি কাউকে গোমরাহ করতে চায়, নবীর পক্ষে ওকে হেদায়েত করা অসম্ভব।

(খ) যে সব আয়াতে বলা হয়েছে-নবী হেদায়েত করেন, ওখানে আল্লাহর অনুমতিতে হেদায়েত করাটা বুঝানো হয়েছে।

(ক) এর উদাহরণ ঃ

(১) إِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ،

নিশ্চয় আপনি যাকে ভাল বাসেন, তাকে হেদায়েত করতে পারেননা। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়েত করেন। এবং তিনি খুবই ভাল মতে জানেন হেদায়েতের উপযোগীদেরকে।

সুক্ষকথা ঃ এ আয়াতে হুযুরের বেলায় اَحْبَبْتَ (যাকে ভাল বাসেন) বলেছেন এবং আল্লাহর বেলায় يَشَاءُ (যাকে ইচ্ছা করেন) বলেছেন। উভয় জায়গায় اَحْبَبْتَ বা يَشَاءُ বলা হয়নি। কারণ, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সমস্ত মখলুখকে ভালবাসেন। তিনি সমস্ত জগতের জন্য রহমত স্বরূপ এবং এটাই তাঁর পছন্দ যে সবাই হেদায়েতপ্রাপ্ত হোক। কিন্তু তাঁর এ মহব্বত দ্বারা হেদায়েত পাওয়া যায় না। তিনি তারই জন্য হেদায়েত কামনা করেন, যার হেদায়েত আল্লাহ চান। যিনি আল্লাহর জন্য ফানা, তিনি তাঁর ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছায় ফানা করে দেন, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু কামনা করেন না। আল্লাহ তাআলাও প্রভূ হিসেবে সমস্ত মখলুককে মহব্বত করেন, কেননা তিনি সমস্ত জগতের প্রভূ। এজন্য পথ প্রদর্শক প্রেরণ করেছেন। তবে ওর হেদায়েতই চান, যার হেদায়েতে রহস্য রয়েছে। তাই হেদায়েত না হুযুরের মহব্বতে পাওয়া যায়, না কেবল আল্লাহর মহব্বতে। হ্যা, আল্লাহর ইচ্ছায় অতপর হুযুরের ইচ্ছায় হেদায়েত নসীব হয়।

(২) وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىْ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ

যদি ওসব কাফিরদের ফেরাটা আপনার কাছে কঠিন মনে হয়, তাহলে যদি পারেন ভূখন্ডে কোন ছিদ্র তালাশ করুন বা আসমানের মধ্যে কোন সিড়ি। অতএব ওদের জন্য নিদর্শন নিয়ে আসুন এবং যদি আল্লাহ চাইতেন, তাদের সবাইকে হেদায়েতর জন্য সমবেত করতেন। তাই আপনি অজ্ঞতার পরিচয় দিবেন না।

(৩) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

তাদের হেদায়েত আপনার উপর নয় কিন্তু আল্লাহ যাকে চান, হেদায়েত দান করেন।

এ রকম সমস্ত আয়াতে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হেদায়েত করা বুঝানো হয়েছে। এটা না নবীর দ্বারা, না কুরআনের দ্বারা সম্ভব।

(খ) এর উদাহরণ ঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১) وَإِنَّكَ لَتَهْدِىْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

হে মাহবুব, আপনি সোজা পথের হেদায়ত করেন।

(২) إِنَّ الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ أَقْوَمُ

কুরআন যে পথের হেদায়াত করে, যেটা সোজা পথ।

(৩) يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ

সেই নবী মুসলমানদের কাছে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং ওদেরকে পবিত্র করেন।

(৪) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى

মাহে রমযান হচ্ছে সেই মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ন করা হয়েছে, লোকদের জন্য হেদায়েত এবং মীমাংসার উজ্জ্বল বর্ণনা রূপে।

এ ধরনের সমস্ত আয়াতে কুনআন, তৌরিত বা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে পথপ্রদর্শক বলা হয়েছে। হেদায়েত হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছায় পথ দেখানো।

কায়দা নং ২৬ ঃ (ক) যে সব আয়াতে বলা হয়েছে- খোদা ভিন্ন অন্য কারো নাম নেওয়া পশু হারাম, ওখানে জবেহ করার সময় কারো নাম নেওয়াটা বুঝানো হয়েছে।

(খ) যে সব আয়াতে বলা হয়েছে-খোদা ভিন্ন অন্য কারো নাম লওয়া পশু হারাম নয়, বরং হালাল, ওখানে পালিত অবস্থায় কারো নাম লওয়াটা বুঝানো হয়েছে। যেমন দেবতাদের নামে ছেড়ে দেয়া পশু বা জায়েদের ছাগল, আবদুর রহিমের গরু ইত্যাদি।

(ক) এর উদাহরণ ঃ

(১) وَمَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

সেই পশু হারাম, যেটা জবেহ করার সময় খোদা ভিন্ন অন্য কারো নাম নেয়া হয়।

(২) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

তোমাদের কি হয়েছে যে সে পশু খাও না, যেটার জবেহের সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে।

(৩) وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

সে পশু হারাম, যেটা মূর্তিদের নামে জবেহ করা হয়েছে।

এ সব আয়াতে সেই পশু খেতে নিষেধ করা হয়েছে, যেটা খোদা ভিন্ন অন্য নামে জবেহ করা হয়েছে। এটাই হারাম হওয়ার কারণ।

(খ) এর উদাহরণ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّحَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ

আল্লাহ তাআলা না বহিরা, না সায়েবা, না অসীলা, এবং না হাম নির্ধারণ করেছেন কিন্তু কাফিরেরা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে।

উপরোক্ত আয়াতে যে পশুগুলোর নাম উল্লেখিত হয়েছে, ওগুলো আরবের মুশরিকদের পক্ষ থেকে দেবতাদের নামে ছেড়ে দেয়া হতো অর্থাৎ জীবিত থাকা কালে ওগুলোকে অন্য নামে ডাকা হতো এবং মুশরিকরা এগুলোকে হারাম মনে করতো। এ হারাম মনে করাটাকে এ আয়াত দ্বারা খন্ডন করা হয়েছে এবং ওগুলোকে হালাল বলা হয়েছে। সুতরাং মুশরিকদের ছেড়ে দেয়া পশু হালাল। এগুলো আল্লাহর নামে জবেহ করে খাওয়া যায়।

কায়দা নং ২৭ ঃ (ক) যে সব আয়াতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে বলানো হয়েছে-আমি নিজের ও তোমাদের উপকারের মালিক নই, ওখানে আল্লাহ মর্জি ছাড়া মালিক নয় বুঝানো হয়েছে।

(খ) যে সব আয়াতে বলা হয়েছে- রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ধনী করে দেন, ওসব আয়াতে আল্লাহর ইচ্ছার ধনী করে দেয়া বুঝানো হয়েছে।

(ক) এর উদাহরণ ঃ

(১) قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ

আপনি বলে দিন, আমি নিজের জানের ভাল মন্দের মালিক নই কিন্তু যা আল্লাহ চান।

(২) وَمَا أُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا

আল্লাহর মুকাবিলায় আমি তোমাদের থেকে কোন কিছু প্রতিহত করতে পারি না।

(৩) مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

يعقوب

আল্লাহর কোন মুসীবত ইয়াকুব প্রতিহত করতে পারতেন না। কিন্তু ইয়াকুবের মনে যে ইচ্ছা ছিল, যেটা পুর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

এসব আয়াতে এটাই বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কিছু করা যায় না। প্রত্যেক কিছু তারই অনুমতির মুখাপেক্ষী।

(খ) এর উদাহরণ ঃ

(১) اغناهم الله ورسوله من فضله

ওদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসুল স্বীয় ফজলে ধনী করে দিয়েছেন।

(২) ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله

তারা যদি সেটার উপর রাজি হতো, যা ওদেরকে আল্লাহ ও রসূল দিয়েছেন।

(৩) اذ تقول للذى انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك

আপনি যখন ওকে বলতেন, যাকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন এবং আপনি নেয়ামত দিয়েছেন, নিজের স্ত্রীকে বাঁধা দাও।

এ সব আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ধনী করে দেন, নেয়ামত দান করেন। এ সব আয়াতে এটাই বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর হুকুমে, আল্লাহর ইচ্ছায় ও অনুমতিতে নেয়ামতও দান করেন এবং মেহেরবানীও করেন। অতএব উভয় প্রকারের আয়াতে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

কায়দা নং ২৮ ঃ (ক) যখন رفع (উঠানো) ক্রিয়ার কর্ম পার্থিব অঙ্গ হয়, তাহলে رفع এর অর্থ হবে উচ্চ জায়গায় উঠানো, আরোহন করানো বা উচ্চ করা।

(খ) যখন رفع এর কর্ম পার্থিব অঙ্গ না হয়, তাহলে এর অর্থ হবে রূহানী উন্নতি, মর্যাদা বৃদ্ধি।

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) ياعيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا

হে ঈসা, আমি তোমাকে মৃত্যু দানকারী এবং আমার দিকে উত্তোলনকারী এবং কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্রকারী।

(২) ورفع ابويه على العرش

হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তাঁর মা-বাপকে সিংহাসনে উঠায়ে নিলেন।

(৩) ورفعنا فوقهم الطور

আমি বনী-ইসলাইলের উপর তুর পাহাড় উঠায়েছি।

(৪) واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت

যখন ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) বায়তুল্লাহর দেয়ালসমুহ উচ্চ করছিলেন।

এ আয়াত সমূহে যেহেতু رفع ক্রিয়ার মফউল (কর্ম) ঈসা (আলাইহিস সালাম) বা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর মাতাপিতা বা তুর পাহাড় বা কাবার দেয়াল এবং এ সব পার্থিব অংশ, সেহেতু এ সব আয়াতে رفع এর অর্থ হবে, উচ্চ জায়গায় পৌছানো, উঠানো, উঁচু করা। কিন্তু এসব আয়াতে رفع এর অর্থ মর্যাদা বৃদ্ধি হবে না।

(খ) এর উদাহরণ ঃ

(১) ورفعنا لك ذكرك

আমি আপনার আলোচনাকে উচ্চস্থান দিয়েছি।

(২) منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات

ওসব নবীদের মধ্যে কতেক এমন আছেন, যাদের সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কতেকের মর্যাদা উচু করেছেন।

(৩) فى بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه

ঐ ঘর সমূহের মধ্যে যেগুলো উচ্চ মর্যাদাবান করার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন এবং যেগুলোতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়।

এ সব আয়াতে رفع এর কর্ম পার্থিব অংশ নয় বরং প্রসংশা বা মর্যাদা বা খোদার নাম, তাই এখানে رفع এর অর্থ জায়গার উচ্চতা হবে না বরং রূহানী উচ্চতাই বুঝানো হয়েছে। এখানে এ অর্থই যথাযত। তাই ঈসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত انى رافعك এর অর্থ হচ্ছে- আমি তোমাকে আসমানে উত্তোলন কারী। তবে এর অর্থ এ নয় যে আমি তোমার মর্যাদা উচ্চকারী, যেমন কাদিয়ানীরা বলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

থাকে। কেননা ঈসা (আলাইহিস সালাম) হচ্ছেন পার্থিব শরীর বিশিষ্ট এবং শরীরের জন্য স্থানগত উচ্চতাই যথাযত।

আপত্তি নং ১ ঃ যদি এ আয়াতে স্থানগত উচ্চতা বুঝানো হয়, তাহলে বলতে হয় যে আল্লাহ তাআলা কোন নিদিষ্ট জায়গায় অর্থাৎ আসমান সমূহে থাকেন। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে رَافِعُكَ اِلَىَّ (আমার দিকে উত্তোলন কারী)। খোদার দিক কোন্‌টি?

জবাব ঃ- এখানে খোদার দিকে উঠানো বলতে আসমানের দিকে উঠানো বুঝায়েছে। কেননা যদিওবা আসমান-জমীন প্রত্যেক কিছু আল্লাহরই, কিন্তু আসমান বিশেষ করে খোদায়ী তজল্লীর স্থান। ওখানে নাই কারো বাহ্যিক রাজত্ব, নাই কুফর, শিরক ও গুনাহ। সুতরাং আসমানে যাওয়াটা যেন খোদার কাছে যাওয়া। এ জন্য বলা হয়েছে - ءَ اَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ 'যিনি আসমানে আছেন, তোমরা কি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছ' বা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন - اِنِّى ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ 'আমি আমার প্রভূর দিকে যাচ্ছি। তিনি আমাকে হেদায়েত করবেন'। অথচ তিনি সিরিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। যেহেতু সিরিয়ায় তাঁর ইবাদত গাহ ছিল, সেহেতু ওখানে যাওয়াটা রবের কাছে যাওয়া বলা হয়েছে। এ কারণেই মসজিদ সমূহকে আল্লাহর ঘর বলা হয়। আল্লাহ ওখানে থাকেন না। কিন্তু যেহেতু ওখানে কোন দুনিয়ারী কাজ হয় না এবং মসজিদ কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন নয়, সেহেতু সেটা আল্লাহর ঘর।

আপত্তি নং ২ ঃ- এ আয়তে বলা হয়েছে- اِنِّى مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ (আমি তোমাকে মৃত্যু দান করবো এবং উঠায়ে নিব) এখানে মৃত্যুর বর্ণনা আগে এবং উঠায়ে নেয়ার কথা পরে বলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে মৃত্যুর পর উঠানো হয়েছে, মৃত্যুর আগে নয়। (কাদিয়ানী)

জবাব ঃ যদি এখানে وَفَاتٌ এর অর্থ মৃত্যু ধরা হয়, তখনও و অব্যয়ের দ্বারা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অপরিহার্য নয় বরং অনেক জায়গায় ধারাবাহিকতার বিপরীত হয়ে থাকে। এখানেও অর্থ হবে এ রকম- আমি প্রথমে তোমাকে উঠায়ে নিব। অতপর মৃত্যু দান করবো। যেমন নিম্নের আয়াত সমূহে আছে।

(১) وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ

হে মরিয়ম তুমি সিজদা কর এবং রূকু কর।

(২) خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং ওদেরকে, যারা

তোমাদের আগে ছিল।

(৩) فَنَمُوْتُ وَنَحْيَا

আমরা মৃত্যু বরণ করবো এবং বাঁচিব।

(৪) خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى

আল্লাহ তাআলা জমীন ও উচু আসমান গুলো সৃষ্টি করেছেন।

(৫) خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ

আল্লাহ মৃত্য এবং জিন্দেগী সৃষ্টি করেছেন।

(৬) وَلَقَدْ اَوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ

নিশ্চয় ওহী করা হয়েছে আপনার প্রতি ও ওসব নবীগণের প্রতি যারা আপনার আগে ছিল।

এ সমস্ত আয়াতে و অব্যয়টি ধারাবাহিকতার বিপরীত। ওখানেও তাই। আর و অব্যয়টি যদি ধারাবাহিকতার বিপরীত নয় বলা হয়, তখন مُتَوَفِّيْكَ এর মধ্যে যে ওফাত শব্দটি আছে, সেটার অর্থ হবে, শোয়ানো বা পুরাটা নেয়া। কুরআন শরীফে এ শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই অর্থ এটাই হবে যে হে ঈসা, আমি তোমাকে শোয়ায়ে আমার দিকে উঠায়ে আনবো বা আমি তোমাকে রূহসহ পরিপূর্ণ শরীর সহকারে আমার দিকে উঠাবো। আল্লাহ তাআলা ফরমান وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى এখানে وَفّٰى এর অর্থ 'পুর্ন করেছে'। আরও ইরশাদ ফরমান وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ এখানে ওফাতের অর্থ শোয়ানো অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাকে রাত্রে শোয়ায়ে দেন। এখানেও এ অর্থ বুঝানো হয়েছে।

কায়দা নং ২৯ ঃ- (ক) যে সব আয়াতে খোদা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতে নিষেধ করা হয়েছে বা বলা হয়েছে-কেবল আল্লাহকেই ভয় কর, ওখানে আজাবের ভয়, হিসেব নিকেশের ভয়, জবাবদিহিতার ভয়, খোদায়িত্বের ভয় বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ কাউকে মাবুদ মনে করে ভয় কর না বা আল্লাহ তাআলার মুকাবিলায় কাউকে ভয় কর না।

(খ) যে সব আয়াতে অন্যদের ভয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বা বলা হয়েছে-অমুক নবী অমুক থেকে ভয় করে, ওখানে কষ্টের ভর, কষ্ট পোছাঁনোর ভয় বা ফিতনার ভয় বুঝানো হয়েছে। সার কথা হচ্ছে, মুমিনের মনে মহা পরাক্রমশালীতার ভয় কেবল আল্লাহরই হওয়া চায় এবং ফিতনা ফ্যাসাদের কষ্টের ভয় মখলুকের হতে পারে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ক) এর উদাহরণ ঃ-

(১) وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ

তোমরা আমার ওয়াদা পূর্ন কর আমি তোমাদের ওয়াদা পূর্ন করবো। এবং কেবল আমাকেই ভয় কর।

(২) فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

অতএব ওসব কাফিরদেরকে ভয় কর না, আমাকে ভয় কর।

(৩) اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ

যারা আল্লাহর পয়গাম পৌছান এবং তাঁকে ভয় করেন এবং আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করেনা।

(৪) فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অতএব ওদেরকে ভয় কর না, আমাকে ভয় কর যদি তোমরা মুসলমান হও।

(৫) اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

সাবধান হও। আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং না তাঁরা চিন্তিত হবেন।

এ রকম ওসমস্ত আয়াত, যেগুলোতে খোদা ভিন্ন অন্যদেরকে ভয় করতে নিষেধ করা হয়েছে, ওগুলোতে খোদায়িত্বের ভয় বুঝানো হয়েছে বা মখলুকের সেই ভয় যেটা আল্লাহর আনুগত্য থেকে বাঁধা দেয়। এ ধরনের ভয় নিষেধ।

(খ) এর উদাহরণ ঃ-

(১) اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ

তোমাদের কতেক স্ত্রী ও কতেক সন্তান তোমাদের শত্রু। ওদের থেকে ভয় কর।

(২) قَالَ رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى

হযরত মূসা ও হারুন আরয করলেন, হে আমাদের প্রভু, আমরা ভয় করছি যে ফেরাউন আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে বা ক্ষেপে যাবে।

(৩) فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ

يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ

অতপর যখন মূসা সেই লাঠিকে সাপের মত লক লক করতে দেখলেন, তখন পিঠ দেখায়ে পালালেন এবং ফিরে তাকালেন না। আল্লাহ বললেন, হে মূসা সামনে এস, ভয় কর না।

(৪) فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى

মূসা (আলাইহিস সালাম) মনে মনে ভয় পেয়ে গেলেন।

(৫) قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে আমার প্রভূ, আমি ওদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে মেরে ফেলেছি। তাই আমি ভয় করছি যে ওরা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

(৬) وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ

তখন ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ওসব ফিরিশতাদের থেকে ভয় পেলেন। ওনারা বললেন, আপনি ভয় করবেন না।

এ রকম অনেক আয়াত আছে, যেগুলোতে মখলুককে ভয় করার নির্দেশ আছে বা মখলুককে ভয় করা প্রমানিত আছে। এ ভয় দ্বারা সেটাই বুঝানো হয়েছে, যা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে অর্থাৎ কষ্টের বা ফিত্নার ভয়। এধরনের ভয়, না ঈমানের বিপরীত এবং না বেলায়ত বা নবুযাতের বরখেলাপ। লক্ষনীয়, মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) হলেন নবী কিন্তু সাপ, ফেরাউন, ফিরিশতা থেকে ভয় করেছেন। তাই এ ধারনায় নবী ওলীগণকে ভয় করা যে ওনারা অসন্তুষ্ট হয়ে বদদুআ করবেন বা আমাদের ক্ষতি হবে, ঈমানের বিপরীত নয়। বরং এতে ঈমান মজবুত হয়। মূসা (আলাইহিস সালাম) এর বদদুআয় ফেরাউনীরা নদীতে ডুবেছে। নূহ আলাইহিস সালামের বদদুআয় দুনিয়ার সমস্ত কাফির ধ্বংস হয়ে গেছে। ওনাদের বদদুআ খুবই মারাত্মক। এমন কি আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার বদদুআ ব্যতীত কাউকে ধ্বংস করেন নি।

কায়দা নং ৩০ ঃ (ক) যে সব আয়াতে নবীর দ্বারা বলানো হয়েছে-আমি তোমাদের মত মানুষ, ওখানে এটাই বুঝানো হয়েছে যে খালেস বান্দা হওয়ার মাপকাটিতে আমি তোমাদের মত মানুষ। অর্থাৎ তোমরা যেমন খোদা নয়, খোদার সন্তান নয় বা খোদার অংশিদার নয়, এ রকম আমিও খোদা নই, খোদার বেটাও নই এবং খোদার অংশিদারও নই। তাঁরই খালেস বান্দা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(খ) যে সব আয়াতে নবীকে মানুষ বলায় কুফবীর ফত্ওয়া দেয়া হয়েছে এবং ওনাকে যারা মানুষ বলেছে, তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে, সেসব আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, যে নবীর সমপর্য্যায় এবং সমান হওয়ার দাবী করে ওনাকে মানুষ বলে বা ওনাকে হেও করার জন্য মানুষ বলে বা এ রকম বলে যে তিনি কোন নবী নয় আমাদের মত মানুষ, সে কাফির।

(ক) এর উদাহরণ ঃ

(১) قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ

বলে দিন, আমি তোমাদের মত মানুষ, তবে আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে-

(২) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ

ওদের রসূলগন ওদেরকে বলেছেন, আমরাতো তোমাদের মত মানুষ। তবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে ইহসান করেন।

এ রকম সমস্ত আয়াতের দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে আমরা ইলাহ না হওয়া এবং খালেস বান্দা হওয়ার দিক দিয়ে তোমাদের মত মানুষ। এর ফলে এ রকম বলাটা অপরিহার্য হয়না যে সাধারণ মানুষ নবীর বরাবর। নিম্নের আয়াতে উপরোক্ত আয়াতের সমর্থন রয়েছে।

(১) وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ

জমীনে বিচরনকারী এমন কোন প্রানী নেই এবং ডানার উপর ভর করে উড়ন্ত এমন কোন পাখী নেই, সবাই তোমাদের মত উম্মত।

(২) مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ

আল্লাহর নূরের উদাহরণ এ রকম, যেমন একটি তাক যার উপর চেরাগ।

এ আয়াত সমূহে সমস্ত পশুগুলোকে মানুষদের মত বলা হয়েছে। অথচ মানুষ আশরাফুল মখলুকাত-সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি। আল্লাহর নূরকে তাক ও চেরাগের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ কোথায় তাক চেরাগ এবং কোথায় আল্লাহর নূর। এ আয়াতদ্বয়ের কারণে এ রকম বলা যায় না যে আমরা পশুর মত বা আল্লাহর নূর তাক এবং চেরাগের মত। অনুরূপ এ রকম বলা যায় না যে আমরা নবীর মত বা নবীর বরাবর। এ ধরনের উদাহরণগুলো হচ্ছে কেবল বুঝানোর জন্য।

(খ) এর উদাহরন ঃ

(১) فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ

কাফিরেরা বললো, মানুষ কি আমাদেরকে হেদায়েত করবে? তাই তারা কাফির হয়ে গেছে। অতপর তারা ফিরে গেল। আল্লাহ পরওয়াহীন।

(২) قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ

ইবরিস বললো, আমার উচিত নয় যে মানুষকে সিজদা করি, যাকে আপনি মাটিদ্বারা তৈরী করেছেন, যেটা কালো কাদার মত ছিল।

(৩) فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

যে কউমের সরদারেরা কুফরী করেছে, ওরা বললো, এতো তোমাদের মত মানুষ।

(৪) وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ

কাফিরেরা বললো, যদি তোমরা তোমাদের মত কোন মানুষের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই ঘৃনিত হিসেবে থাকবে।

(৫) فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ

ফেরাউনের অনুসারীরা বললো, আমরা কি ঈমান আনবো আমাদের মত দু'ব্যক্তির উপর, যাদের কউম আমাদের বন্দেগী করছে।

এ রকম সমস্ত আয়াতে বলা হয়েছে-নবীকে মানুষ বলা প্রথমত শয়তানের কাজ ছিল, অতপর কাফিরেরা বলেছে। মুমিনগন এ রকম কখনো বলেন নি। ওসব কাফিরদের কুফরীর সবচে বড় কারণ এটাই ছিল যে ওরা নবীগনের সমতুল্যের দাবিদার হয়ে ওনাদেরকে তাদের মত মানুষ বলতো।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সল্লাম) বারবার বান্দা ও মানুষ হওয়ার ঘোষনা দেয়ার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে ঈসায়ীগন- ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর মধ্যে দুটি মুজেজা দেখে ওনাকে খোদার বেটা বলে ফেললো। এ মুজেজা দুটির একটি হলো বাপ ছাড়া জন্ম হওয়া, অপরটি হলো মৃতকে জীবিত করা। মুসলমানগণ হুযুরের শত শত মুজেজা দেখেছে। চাঁদকে টুকরা হতে, সুর্য ফিরে আসতে দেখেছে, পাথরকে কলেমা পড়তে দেখেছে, আঙুল সমূহ থেকে পানির ঝর্না প্রবাহিত হতে দেখেছে। সন্দেহ ছিল, ওনারাও হুযুরকে খোদা বা খোদার বেটা বলে ফেলে কিনা। তাই এ ব্যাপারে সতর্কতার জন্য বারবার 'মানুষ' বলে ঘোষনা করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআনী মাসায়েল

এ অধ্যায়ে ওসব জরুরী মাসায়েল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, যেগুলোকে কতেক লোক অস্বীকার করে। অথচ এ গুলো কুরআন দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত আছে। এ সব মাসায়েলের সমর্থনে কেবল কুরআনী আয়াতই পেশ করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উসীলায় আমার এ শ্রম যেন গ্রহন করেন, এ প্রত্যাশা নিয়ে কলম ধরলাম।

মাসআলা নং ১

আল্লাহর ওলীগনের কারামাত হক।

নবুয়াত প্রাপ্তির আগে নবীগন থেকে যে সব অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর কাজকর্ম প্রকাশ পায়, ওগুলোকে এরহাস বলা হয়। যেমন জন্মের পর পর হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর কথা বলা, আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে শৈশব কালে কংকর ও পাথর সালাম করা। নবুয়াতের পর অলৌকিক, অস্বাভাবিক কাজকর্ম যা প্রকাশ পায়, ওগুলোকে মুজিজা বলা হয়। যেমন মূসা (আলাইহিস সালাম) এর লাঠি, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক চাঁদকে দুটুকরা করা, সুর্যকে ফিরায়ে আনা ইত্যাদি। ওলীগণ থেকে এ ধরণের যা প্রকাশ পায়, ওগুলোকে কারামাত বলা হয় এবং এ ধরনের অস্বাভাবিক কাজকর্ম,যা কাফিরদের থেকে প্রকাশ পায়, ওগুলোকে ইসতেদরাজ বলা হয়। যেমন দাজ্জালের বৃষ্টি বর্ষন, মৃতকে জীবন দান ইত্যাদি।

আল্লাহর মেহেরবানীতে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন ফেরকা সৃষ্টি হয়নি, যারা মুজিজাকে অস্বীকার করে। কাদিয়ানীরা শুধু হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর মুজিজাকে অস্বীকার করে। সেটা শুধু এ জন্য যে ওদের প্রত্যাগত মসীহের মধ্যে কোন মুজিজা নেই। তাদের কথা হলো যেহেতু আসল মসীহের মধ্যে কোন মুজিজা ছিল না, সেহেতু ওনার অনুরূপ মসীহের (গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানী) মধ্যে কোন মুজিজা নেই। না হয় ওরাও মুজিজার বিশ্বাসী.কুরআন করীমকে হুযুরের মুজিজা

হিসেবে স্বীকার করে। তবে অনেক লোক ওলীগণের কারামাতের অস্বীকারকারী হয়ে গেছে এবং এধরণের অভিমত প্রকাশ করেছে যে সমস্ত কারামত বানানো কল্প কাহিনী, কুরআন দ্বারা প্রমানিত নেই। আমি কুনআনের সে সব আয়াত পেশ করছি, যেগুলোতে সুস্পষ্ট ভাবে কারামতের বর্ণনা আছে।

(১) كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يامريم انى لك هذا قالت هو من عند الله

যখন যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) মরিয়মের কাছে এসে অকালের ফল দেখতে পেলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, হে মরিয়ম, তোমার কাছে এগুলো কোথেকে এলো? তিনি বললেন, এগুলো আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।

হযরত মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) বনী ইসরাঈলের ওলী ছিলেন। তালাবদ্ধ কুটরীতে ওনাকে অদৃশ্য থেকে অকালের ফল প্রদান করা হয়েছে। এটা ওলীর কারামত।

(২) ولبثوا فى كهفهم ثلث مائة سنين وازدادوا تسعا

আসহাবে কাহাফ গুহায় তিনশ বছর অতিক্রম করে আরও নয় বছর অবস্থান করেছেন।

আসহাবে কাহাফ নবী ছিলেন না বরং বনী ইসরাঈলের ওলী ছিলেন। এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে ওনারা তিনশ নয় বছর গুহায় ঘুমানো অবস্থায় ছিলেন। এত দীর্ঘ সময় পানাহার বিনা শুইয়ে থাকা ও জীবিত থাকা বড় কারামত।

(৩) وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد

তোমরা ওদেরকে জাগ্রত মনে করছ। আসলে ওরা ঘুমাচ্ছে এবং আমি ওদেরকে ডান-বাম পাশ ফিরায়েদি এবং তাদের কুকুর স্বীয় পা প্রসারিত করে গুহার মূখে শুইয়ে রয়েছে।

এ আয়াতে আসহাবে কাহাফের তিনটি কারামত বর্ণিত হয়েছে-এক, জেগে থাকার মত এখনও শুইয়ে থাকা, দুই, আল্লাহর পক্ষ থেকে পাশ ফিরানো, ওদের শরীরকে মাটি খেয়ে না ফেলা এবং বিনা আহারে জীবিত থাকা, তিন, ওদের কুকুর তখনও জীবিত অবস্থায় শুইয়ে থাকা, (এটা তাঁদেরই কারামত, কুকুরের নয়),

(৪) وقال الذين عنده علم من الكتب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك

যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বললো, আমি চোখের পলক মারার

pdf By Syed Mostafa Sakib

আগেই বিলকিসের সিংহাসন আপনার কাছে নিয়ে আসবো।

এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের ওলী হযরত আসফ বিন বরখিয়ার কয়েকটি কারামত বর্নিত হয়েছে। যেমন কারো কাছে জিজ্ঞেস না করে ইয়ামনে পৌছে যাওয়া, ওখান থেকে ভারী সিংহাসন নিয়ে আসা, সিরিয়া থেকে ইয়ামন এক মূহুর্তের মধ্যে যাওয়া আসা করা।

(৫) فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا

হযরত মূসা ও খিজির (আলাইহিস সালাম) চলতে চলতে কিছু দূর যাওয়ার পর যখন নৌকায় আরোহন করলেন, তখন খিজির নৌকা ফুটো করে দিলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, তুমি কি এ জন্য ফুটো করলে যেন নৌকার আরোহীরা ডুবে যায়?

সম্ভবত: খিজির (আলাইহিস সালাম) কোন কউমের ওলী ছিলেন। এ আয়াতে তাঁর এ কারামত বর্নিত হয়েছে যে তিনি নৌকা ফুটো করে দিলেন কিন্তু নৌকা ডুবলো না। অথচ মূসা (আলাইহিস সালাম) শংকিত হয়েছিলেন।

(৬) وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا

হযরত খিজির বললেন, এ ছেলের মা-মাপ মুমিন। আমি ভয় করলাম যে সে ওদেরকে অবাধ্যতা ও কুফরীতে লিপ্ত করতে পারে।

এ আয়াতে হযরত খিজির (আলাইহিস সালাম) এর আর একটি কারামত বর্ণিত হয়েছ যে তিনি যে ছেলেকে হত্যা করেছেন, তার পিতা মাতার পরিনতি সম্পর্কে জানতেন যে ওরা মুমিন থাকবে এবং এ ছেলে কাফির হবে। অথচ এটা পঞ্চ জ্ঞানের অন্যতম।

(৭) وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا

হযরত খিজির বললেন, এ দেয়ালের নীচে দুইএতীম শিশুর ধনভান্ডার রয়েছে এবং ওদের পিতা নেককার ব্যক্তি ছিল।

এ আয়াতে খিজির (আলাইহিস সালাম) এর এ কারামত বর্ণিত হলো যে তিনি মাটির নীচে লুকায়িত জিনিসের খবর জানতেন।

এ রকম অনেক আয়াতে আল্লাহর ওলীগণের কারামত, যেমন অদৃশ্য জ্ঞান, মূহুত্বে অনেক দুর সফর করা, পানাহার বিনা দীর্ঘ দিন জীবিত থাকা-এ রকম অনেক কারামতের কথা বর্নিত আছে।

মাসআলা নং ২

আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ আল্লাহর অনুমতিতে মুশকিল আসানকারী, হাজত পুর্নকারী ও বালা মুসিবত দমনকারী।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগন আল্লাহর হুকুমে বান্দাদের হাজত পুর্ণ করেন, নানা সমস্যার সমাধান করেন। ওনারা নিকট বা দূরবর্তী যে কোন জায়গা থেকে কোন মাধ্যম ছাড়া মুশকিল আসান ও সাহায্য করেন। কুরআন করীমে বর্ণিত আছে-

(১) اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا

আমার এ কোর্তা নিয়ে যাও। একে আমার আব্বার চেহারার উপর রেখ। ওনার চোখ খুলে যাবে।

(২) فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا

অতপর যখন সুসংবাদ দাতা আসলো, সেই কোর্তা ইয়াকুব (সালাইহিস সালাম) এর চেহারার উপর রাখলো, তখনই ওনার চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসলো।

ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) অন্ধ হয়ে গিয়ে ছিলেন। ওনার এ মুসিবতকে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) স্বীয় কোর্তা দ্বারা বিদূরিত করলেন। কোর্তা দ্বারা আরোগ্য দান করা মানে মাধ্যম বিহীন সাহায্য করা। কেননা কোর্তা আরোগ্য দানের কোন মাধ্যম নয়।

(৩) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ

নিশ্চয়ই যুলেখা ইউসুফের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)ও মনস্থির করে ফেলতেন, যদি স্বীয় প্রভূর দলীল না দেখতেন।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)কে যুলেখা সাত কুটরীর অভ্যন্তরে বন্ধ করে তার দিকে আকৃষ্ট করতে চাইলো। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) সে সময় তাঁর সামনে ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) কে দেখলেন যে তিনি ইশারায় নিষেধ করছেন। যার ফলে তাঁর মনে ও দিকের কোন আগ্রহ সৃষ্টি হলো না। এটাই ছিল আল্লাহর দলীল, যা এ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) সুদূর কেনান অবস্থান করে মিসরের বন্ধ কুটরীতে আবদ্ধ ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কে বড় বিপদ ও গুনাহের খেয়াল থেকে রক্ষা করলেন। এটাই হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের বিপদ দূরীকরণ ও মাধ্যমবিহীন সাহায্য কর।

(৪) وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীদেরকে আরোগ্য করি এবং মৃতদেরকে জীবিত করি।

অন্ধত্ব ও কুষ্ঠরোগ বালা বিশেষ, যা আল্লাহর হুকুমে ঈসা (আলাইহিস সালাম) আরোগ্য করতে পারেন। সুতরাং আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ বালা মসীবত দমনকারী হয়ে থাকেন অর্থাৎ ওনারা কোন উপকরণ ছাড়া মুশকিল কোশা বা মুশকিল আসান করেন।

(৫) فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

আমি মূসা (আলাইহিস সালাম) কে বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। সাথে সাথেই সেই পাথরে বারটি ঝরনা প্রবাহিত হয়ে গেল।

বনী ইসরাঈলের লোকেরা তিহ ময়দানে পানির সংকটে পড়লে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সরাসরি পানির ব্যবস্থা করে দেননি। বরং মূসা (আলাইহিস সালাম) কে বললেন, তুমি ওদের জন্য বালা বিদূরিতকারী হয়ে যাও, যাতে ওরা পানি লাভ করে। তাই বুঝা গেল যে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ আল্লাহর হুকুমে অলৌকিক ভাবে বালা মসীবত বিদূরিত করে থাকেন।

(৬) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

জিব্রাঈল মরিয়মকে বললেন আমি হলাম তোমার প্রভূর দূত। আমি এসেছি তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করার জন্য।

এতে বুঝা গেল যে জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর হুকুমে সন্তান দান করেন। অর্থাৎ বান্দাদের হাজত পুর্ণ করেন।

(৭) وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

হে মাহবুব, যদি এসব অপরাধী লোক নিজেদের উপর জুলুম করে আপনার কাছে ধর্না দেয় এবং আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করে এবং আপনিও ওদের জন্য সুপারিশ করেন, তাহলে আল্লাহকে দয়াবান তওবা কবুলকারী হিসেবে পাবে।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে যারা গুনাহ রোগে আক্রান্ত, তারা যেন হুযূরের আরোগ্যনিকেতনে যায়, ওখানে আরোগ্য লাভ করবে। তিনি আরোগ্য দানকারী এবং গুনাহ ক্ষমা করায়ে দেন।

(৮) اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

হে আইয়ুব, মাটির উপর তোমার পা দিয়ে আঘাত কর। এতে সৃষ্ট শীতল পানির ঝর্না গোসল ও পান করার জন্য।

আইয়ুব (আলাইহিস সালাম) এর রোগ এভাবে দূরীভূত করা হয়েছিল যে ওনাকে বলা হলো নিজের পা মাটিতে ঘর্ষন কর। ঘর্ষনের দ্বারা পানির ঝর্না সৃষ্টি হলো। অত:পর তাঁকে বলা হলো ওখান থেকে পানি পান কর এবং গোসল করে নাও। পানি পান করার দ্বারা শরীরের ভিতরের কষ্ট বিদূরিত হলো এবং গোসলের দ্বারা শরীরের বাইরের রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলেন।

এতে বুঝা গেল যে নবীগণের পদাঘাতে উৎপন্ন পানি আল্লাহর হুকুমে শেফা দান করে। জমজমের পানি এ জন্যই শেফাদায়ক যে এটা হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) এর পায়ের গোড়ালীর আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে। মদীনা শরীফের মাটিকে খাকে শেফা (শেফাদায়ক মাটি) বলা হয়। কেননা এ মাটি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পায়ের ছোঁয়া পেয়েছে। তাই বুঝা গেল যে বুযুর্গ ব্যক্তিগণ কোন মাধ্যম ছাড়া বালা মসীবত দূরীভূত করতে পারেন।

(৯) فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي

অতপর আমি ফিরিশতার পদচিহ্ন থেকে একমুষ্টি মাটি নিয়ে নিলাম। এর পর এ মাটি সেই গোবাছুরের মধ্যে দিয়ে দিলাম। আমার মন এ রকম করতে চাইলো।

সামিরী হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) এর ঘোড়ার খুরের নীচের মাটি উঠায়ে নিয়ে ছিল এবং সেই মাটি সোনার তৈরী গোবাছুরের মুখে ঢুকায়ে দিয়েছিল, যার ফলে সেটার মধ্যে প্রানের সঞ্চার হয়েছিল এবং সেটা আওয়াজ করতেছিল। উপরোক্ত আয়াতে এটাই বর্নিত হয়েছে। তাই বুঝা গেল যে বুযুর্গগণের স্পর্শিত জিনিস আল্লাহর হুকুমে নিস্প্রান পদার্থের মধ্যে প্রানের সঞ্চার করতে পারে।

(১০) أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ

আলামত হচ্ছে, তোমাদের কাছে সিন্ধুক আসবে, যার মধ্যে তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে মনের প্রশান্তি এবং হযরত মূসা ও হযরত হারুনের পরিত্যক্ত জিনিস পত্র থাকবে। একে ফিরিশতাগণ বহন করে নিয়ে আসবে।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলকে একটি সিন্ধুক দান করা হয়েছিল,

pdf By Syed Mostafa Sakib

যার মধ্যে হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম) এর পাগড়ী, হযরত হারুন (আলাইহিস সালাম) এর পাদুকা শরীফ ইত্যাদি ছিল। ওদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে যুদ্ধে এটাকে যেন ওদের সামনে রাখে, এতে ওদের জয়লাভ হবে। এ ঘটনটিই এ আয়াতে বর্নিত হয়েছে। এ কাহিনী থেকে বুঝা গেল যে বুযুর্গানে কিরামের তাবরুকসমূহ ওনাদের ওফাতের পরও বালা মুসীবত দূরকারী। লক্ষ্যনীয় যে মাটির দ্বারা প্রানের সঞ্চার এবং তাবরুকাত দ্বারা যুদ্ধে জয়লাভ করা অস্বাভাবিক সাহায্য বৈ অন্য কিছু নয়।

(১১) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আযাব দিবেন না, যেহেতু আপনি তাদের সাথে আছেন।

(১২) لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

যদি মুসলমানগণ মক্কা থেকে বের হয়ে যেত, তাহলে আমি কাফিরদের উপর আযাব পাঠাতাম।

(১৩) فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

অতপর আমি বের করে দিয়েছি কউমে লুতের এলাকা থেকে ওসব মুমিনগণকে যারা ওখানে ছিল।

এ আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অবস্থানের কারণে দুনিয়াতে সার্বিক ভাবে আযাব আসেনি। মক্কাবাসীর উপর মক্কাবিজয়ের আগে এ জন্য আযাব আসেনি যে ওখানে তখন কিছু গরীব মুসলমান ছিল। কউমে লুতের উপর আযাব আসার আগে ওখান থেকে মুমিনদেরকে বের করে দেয়া হয়েছিল। এতো বুঝা গেল নবীগণ ও মুমিন গণের উসীলায় খোদায়ী আযাব আসেনা। তাঁরা বালা-মুসীবত দূরকারী। বর্তমান যুগে আমাদের এত গুনাহের পরও যে সার্বিক আযাব আসতেছেনা, তা একমাত্র সেই সবুজ গম্বুজেরই মহিমা।

আলা হযরত খুব সুন্দর বলেছেন-

تمہی شافع ہر ایا- تمہی دافع بلایا!

تمہی قاسم عطایا کوئی تم ساکون ایا!

অর্থাৎ হে নবী, আপনাকে আল্লাহ তাআলা প্রধান সুপারিশকারী হিসেবে ধন্য করেছেন। বালামুসীবত দূর কারী হিসেবে আপনাকে আখ্যায়িত করেছেন। আপনাকে বন্টন করার ক্ষমতা দান করেছেন। আপনার মত দুনিয়াতে আর কেউ আসেনি।

আপত্তি ঃ কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমানিত আছে যে অনেক বার নবীগন অনেকের

জন্য দুআ বা বদদুআ করেছেন কিন্তু কবুল হয়নি। তাহলে ওনারা মুশকিল আসানকারী বা বালা মুসীবত দুরকারী কি করে হতে পারে?

জবাবঃ নবী-ওলীগণ হলেন আল্লাহর হুকুমে মুশকিল আসানকারী এবং বালা-মুসীবত দূরকারী। যেখানে আল্লাহর অনুমতি থাকে না, সেখানে বালা-মুসীবত দূর হয় না। প্রত্যেক জিনিসের এ অবস্থা যে আল্লাহর হুকুমে উপকার বা অপকার হয়। নবী-ওলীগণও আল্লাহর হুকুমে অস্বাভাবিকভাবে সাহার্য করেন, মুশকিল আসান করেন বালা মুসীবত দূর করেন।

মাসআলা নং ৩

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মুখ থেকে যা বের হয়, তা বাস্তবে পরিনত হয়।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের মুখ كُن (হয়ে যাও) এর চাবি। ওনাদের মুখ থেকে যা বের হয়, তা আল্লাহর হুকুমে বাস্তবায়িত হয়ে যায় । কুরআন শরীফের অনেক আয়াতে এর প্রমান রয়েছে। যেমন-

(১) قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَامِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, ঠিক আছে, যাও। দুনিয়ারী জিন্দেগীতে তোমার শাস্তি হচ্ছে-তুমি বলে বেড়াবে যে তোমাকে যেন কেউ স্পর্শ না করে এবং নিশ্চয়ই তোমার জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় আছে, যেটা তোমার বেলায় ব্যতিক্রম হবে না।

মূসা (আলাইহিস সালাম) সামেরীর উপর ভীষন নারাজ হয়ে গিয়েছিলেন। কেননা সে গোবাছুর তৈরী করে লোকদেরকে মুশরিক করে ফেলেছিল। তিনি সামেরীকে বলেছিলেন, যাও, তোমার শরীরে এমন এক প্রভাব সৃষ্টি হবে যে যাকে তুমি স্পর্শ করবে বা যে তোমাকে স্পর্শ করবে, তারও জ্বর আসবে এবং তোমারও। এ রকমই হয়েছিল। সে লোকদেরকে বলতো, আমাকে কেউ স্পর্শ করিওনা। এটাতো দুনিয়ার শাস্তি। এ ছাড়া রয়েছে পরকালের শাস্তি।

(২) وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ- قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيَانِ

দ্বিতীয় কয়েদীকে শুলে দেয়া হবে। অতপর পাখীরা ওর মাথা ভক্ষন করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ বিষয়ে ফয়সালা হয়ে গেছে, যেটার ব্যাপারে তুমি প্রশ্ন করেছ।

কারাগারে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কে এক কয়েদী স্বীয় স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলো। তিনি এর তাবীর করে বললেন, তোমাকে শুলে চড়ানো হবে। সে বললো, আসলে আমি কোন স্বপ্নই দেখিনি, আপনাকে মজাক করে বলেছি। তিনি বললেন, তুমি স্বপ্ন দেখেছ বা দেখনি, সেটা এখন আর বিবেচ্য নয়। আমার মুখ থেকে যা বের হয়েছে, সেটা আল্লাহর দরবারে ফয়সালা হলে গেছে। এতে বুঝা গেল, ওনার মুখ আল্লাহর কলম।

(৩) رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ

(মূসা আলাইহিস সালাম আরয করলেন) হে প্রভূ, ফেরাউনীদের মাল-পত্র ধ্বংস করে দাও এবং ওদের মন কঠিন করে দাও। অতএব এরা ঈমান আনবে না, যতক্ষন না ভয়াবহ আযাব দেখবে।

মূসা (আলাইহিস সালাম) ফেরাউনীদের জন্য তিনটি বদদুআ করেছিলেন এক, ওদের সম্পদ যেন ধ্বংস হয়ে যায়, দুই, জীবনে যেন ঈমান না আনে, তিন, মৃত্যুর সময় ঈমান আনলেও যেন কবুল না হয়। বাস্তবেএরকমই হয়েছিল। ফেরাউনীদের টাকা পয়সা ক্ষেত-খামার সব পাথর হয়ে গিয়েছিল, জিন্দেগীতে ওদের ঈমান আনার তৌফিক হয়নি। মৃত্যুসায়াহ্নে নদীতে ডুবার সময় ফেরাউন ঈমান আনলো এবং বললো اٰمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ (আমি হযরত মুসা ও হারুনের প্রভূর উপর ঈমান আনলাম।) কিন্তু ঈমান কবুল হলোনা। দেখুন, ফেরাউন ছাড়া কোন কাফির কউম ঈমান এনে মরেনি। হযরত মূসা কলিমুল্লাহ (আলাইহিস সালাম) এর মূখ থেকে যা বের হয়েছে, সেটাই বাস্তবায়িত হয়েছে।

(৪) وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ

যখন ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) আরয করলেন, মওলা, এ জায়গাকে শান্তির শহর বানিয়ে দাও এবং এখানকার অধিবাসীদেরকে নানা ফলমূল দান কর।

(৫) وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

(ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) দুআ করেছেন) আমার বংশধরদের মধ্যে একটি দলকে সদা অনুগত রেখো।

(৬) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ

হে আল্লাহ, আমার এ অনুগত দলের মধ্যে সেই শেষ নবীকে প্রেরন কর, যিনি ওদের কাছে তোমার আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করবেন।

(৭)رَبَّنَا اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ

হে আল্লাহ, আমি আমার কিছু বংশধরকে তোমার পবিত্র ঘরের কাছে এক জংগলে বাস করতে দিয়েছি, যেখানে কোন ক্ষেত খামার নেই। হে আল্লাহ, তা এজন্য করেছি যেন তারা নামায কায়েম রাখে। তাই কিছু লোকের মন ওদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও, ওদেরকে কিছু ফল খেতে দাও, যাতে তারা শোকর গুজার করে।

এ আয়াতেসমূহে আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এর নিম্নের দুআসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

(১) জংগলকে শহর করে দাও। (২) শহরটি যেন শান্তির হয়। (৩) এখানকার বাসিন্দাদেরকে জীবিকা ও ফল দান কর। (৪) আমার বংশধরের সবই যেন কাফির হয়ে না যায়। সবসময় নিশ্চয় যেন কিছু মুসলমান থাকে। (৫) এ মুসলমানদের মধ্যে থেকে যেন শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আবির্ভাব হয়। (৬) লোকদের মন সেই বস্তির দিকে আকৃষ্ট করে দাও।(৭) এ লোকেরা যেন নামায কায়েম রাখে।

এ সাতটি দুআ কি রকম কবুল হয়েছে, মক্কা শরীফের দিকে লক্ষ্য করলে অনায়াসে বুঝা যাবে। আজ পর্যন্ত মক্কা শরীফ আবাদ আছে। তাঁর সমস্ত বংশধর কাফির হয়নি। সৈয়দ বংশের সবাই গোমরাহ হতে পারে না। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সেই মুমিন দলের মধ্যে আবির্ভূত হন। ওখানে ক্ষেতখামার না থাকলেও রুজি রোজগার ও ফলমূলের কোন অভাব নেই। সব জায়গায় দুর্ভিক্ষে লোক মারা যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত ওখানে দুর্ভিক্ষে কোন লোক মারা যায়নি। মুসলমানগনের মন মক্কা শরীফের দিকে কি রকম আকৃষ্টতা দিনরাতের আনাগোনা দেখলে বুঝা যায়। এমন কি ফাসিক-ফাজিরও মক্কার জন্য উৎসর্গিত।

বিঃ দ্রঃ হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এর মুখ থেকে বের হয়েছিল بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ (ক্ষেত খামারবিহীন জংগল)। ওনার কথার তাছির দেখুন, আজ পর্যন্ত ঐ জায়গায়টি বালুময়ই আছে। ওখানে কোন ক্ষেত হয় না। এটা ওনার

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুখের তাছির হবেইনা কেন। আল্লাহ তাআলা বললেন- নিজের ছেলেকে জবেহ করে দাও। তিনি আরয করলেন, খুবই ভাল, কোন আপত্তি নেই। আল্লাহ বললেন, নিজেকে নমরূদের আগুনে নিক্ষেপ কর। তিনি আরয করলেন, আমি খুবই সন্তুষ্ট। আল্লাহ বললেন, নিজের স্ত্রী-সন্তানকে গহীন জংগলে দানা-পানি বিহীন অবস্থায় রেখে এসো। তিনি আরয করলেন, ঠিক আছে, কোন আপত্তি নেই। তিনি কোন প্রশ্ন করেন নি । তিনি যখন আল্লাহকে এ ভাবে মান্য করলেন, তখন আল্লাহও তাঁর প্রতিটি দুআ অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিলেন। মোট কথা, ওনার মুখ كن (হয়ে যাও) এর চাবি তুল্য।

(৮) وَقَالَ نُوْحٌ رَبِّ لَاتَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا – اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا – رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَاتَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا

নূহ (আলাইহিস সালাম) আরয করলেন হে প্রভূ জমীনের উপর কাফিরদের মধ্যে কোন বসবাসকারীকে রক্ষা কর না। যদি তুমি ওদেরকে রক্ষা কর, তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করবে এবং বদকার ও অকৃতজ্ঞ ছাড়া ভাল সন্তান জন্ম দিবে না। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, আমার মা-বাপকে ক্ষমা কর এবং ওদেরকে ক্ষমা কর, যারা ঈমানসহকারে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে এবং সকল মুসলমান নর-নারীকে ক্ষমা কর এবং কাফিরদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি কর না।

সূরা নূহের এ শেষ তিন আয়াতে নূহ (আলাইহিস সালাম) এর তিনটি দুআর কথা বর্নিত হয়েছে-(১) সমস্ত কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দাও, কারণ ওদের সন্তানও কাফির হবে। (২) আমাকে ও আমার মা-বাপকে ক্ষমা কর এবং (৩) আমার ঘরে যেসব ঈমানদারেরা আশ্রয় নিয়েছে, ওদেরও ক্ষমা কর। এ দুআগুলো আল্লাহ তাআলা অক্ষরে অক্ষরে কবুল করেছেন। সম্পুর্ন পৃথিবীকে ডুবায়ে দেয়া হলো। তাঁর মা-বাপকে ক্ষমা করা হলো এবং নৌকায় আরোহনকারীদেরকে রক্ষা করা হলো। উপরোক্ত আয়াত থেকে এটাও বুঝা গেল যে হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) নবুয়াতের দৃষ্টিশক্তি দ্বারা ভবিষৎ বংশধরদের অবস্থা জেনে নিয়েছিলেন যে ওরা কাফির হবে। মোট কথা ওনাদের পবিত্র মুখ كُنْ (হয়ে যাও) এর চাবিকাটি।

এ কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে নবীগণের যে দুআটি আল্লাহর মর্জির বিপরীত হয়েছে, সেটা থেকে ওনাদেরকে বাঁধা দেয়া হয়েছে, যাতে ওনাদের পবিত্র মুখের অসম্মানী না হয়। এতেও ওনাদের মহান শানমান প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ

ফরমান।

يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ

হে ইব্রাহীম, এ দুআ থেকে বিরত থেকো। নিশ্চয় সে ব্যাপারে তোমার প্রভূর হুকুম হয়ে গেছে। কওমে লুতের উপর আযাব আসবেই, যা অপ্রতিরোধ্য।

لَاتُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

মুনাফেকদের মধ্যে কেউ মারা গেলে আপনি ওর জানাযার নামায পড়বেন না এবং ওর কবরে দাঁড়াবেন না।

ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) কউমে লুতের জন্য দুআ করেছিলেন। কিন্তু ওদের নাজাত যেহেতু আল্লাহর অভিপ্রায়ের বিপরীত ছিল, সেহেতু তাঁকে বাঁধা দেয়া হয়েছিল। আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কেও মুনাফিকের জানাযা থেকে বারন করা হয়েছিল। কেননা জানাযার নামাযে মৈয়তের জন্য দুআ বখশিশ করা হয়। কিন্তু মুনাফিকদের জন্য দুআ বখশিশ আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত ছিল। তাই তাঁকে এবং তাঁর উসীলায় সবাইকে এর থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

সারকথা হলো ওনাদের দুআ কবুল হওয়ার মধ্যে যেমন ওনাদের মাহাত্ম্য রয়েছে, কোন কারণে ওনাদের দুআ কবুল না হওয়ার মধ্যেও ওনাদের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। তাঁদের মত কেউ হতে পারেনা।

মাসআলা নং ৪

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ দূর থেকে শুনেন ও দেখেন

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ নিকট ও দূরের জিনিসসমূহ দেখেন এবং দূরের ছোট আওয়াজও আল্লাহর হুকুমে শুনেন। কুরআন করীমে এর প্রমান রয়েছে। যেমন-

(১) قَالَتْ نَمْلَةٌ يٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ– فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا

একটি পিপীলিকা বললো, হে পিপীলিকার দল, নিজ নিজ ঘরে চলে যাও। যাতে সুলাইমান ও তাঁর সৈন্যবাহিনী অজান্তে তোমাদেরকে পদদলিত না করে। সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) সেই পিপীলিকার আওয়াজ শুনে মুছকি হাসলেন।

পিপড়ার আওয়াজ খুবই ছোট, যা আমরা খুবই কাছ থেকেও শুনিনা। কিন্তু হযরত

সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) কয়েক মাইল দূর থেকে সেই পিপড়ার আওয়াজ শুনে ছিলেন, পিপড়াটি পিপড়ার দলকে ঐ সময় সতর্ক করছিল, যখন সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) এর বাহিনী তিন মাইল দূরত্বে ছিল এবং তখনও জংগলে প্রবেশ করে নি। তাই তিনি এ আওয়াজ নি:সন্দেহে তিন মাইল দূর থেকে শুনেছিলেন। আর পিপড়া যে বলেছে 'তোমাদেরকে অজান্তে পদদলিত করবে'-এর দ্বারা ওনাদের অজ্ঞতার কথা বুঝানো হয়নি বরং ওনাদের ন্যায় পরায়নতার কথাই প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ ওনারা নিরাপরাধ পিপড়াকেও মারেনা। যদি তোমরা পদদলিত হও, তাহলে সেটা তাদের অসাবধাণতার কারণে হবে। তোমাদের প্রতি খেয়াল করবে না আর তোমরা পদদলিত হয়ে যাবে।

(২) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْ لَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ

কাফেলা যখন মিসর ত্যাগ করলো, তখন এখানে তাদের পিতা বললেন- আমি ইউসুফের সুঘ্রান পাচ্ছি, যদি তোমরা আমাকে পাগল না বল।

ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) কেনানে আর ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর জামা নিয়ে কাফেলা মিসর থেকে বের হয়েছে। এ দিকে তিনি এখান থেকে সুঘ্রান পেয়ে গেলেন। এটা হলো নবুয়াতের শক্তি।

(৩) قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ

যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বললো- আপনার পলক মারার আগেই আমি সেটা আপনার কাছে হাজির করবো।

আসাফ রয়েছেন সিরিয়াতে আর বিলকিসের সিংহাসন হলো ইয়ামনে। কিন্তু মূহুত্বের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবেন বলে ঘোষনা দিচ্ছেন। না দেখে, না জেনে এ রকম বলাটা অসম্ভব। নিশ্চয় তিনি সেই সিংহাসন এখান থেকে দেখছিলেন। এটা হচ্ছে ওলীর দৃষ্টি শক্তি।

(৪) وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ

হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমি তোমাদেরকে সে বিষয়ে খবর দিচ্ছি, যা তোমরা নিজ নিজ ঘরে খাও এবং যা সঞ্চয় কর।

হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর চোখ ঘরের ভিতরে যা হচ্ছে, তা দূর থেকে দেখছেন। তিনি দেখছেন যে কে খাচ্ছে এবং কি রেখে দিচ্ছে। এটা হচ্ছে নবীর দৃষ্টি শক্তি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

সেই ইবলিস ও তার বংশধর তোমরা সবাইকে এমন জায়গা থেকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা ওদেরকে দেখ না।

(৬) قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ

বলে দিন, তোমরা সবাইকে মৃত্যুর ফিরিশতা মৃত্যু ঘটাবে, যাকে তোমাদের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে।

শয়তান ও তার বংশধরকে গোমরাহ করার এবং মৃত্যুর ফিরিশতাকে জান বের করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তারা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ বরং প্রতিটি প্রানীকে দেখে। তাই নবী ওলীগণ, যারা হচ্ছেন পথ প্রদর্শক ও হেদায়েত কারী, সমগ্র জগত সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞাত থাকাটা অপরিহার্য, যাতে ঔষধের পাওয়ার রোগের তুলনায় কম না হয়।

(৭) وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ

লোকদেরকে হজ্বের কথা ঘোষনা করে দাও। তারা তোমার কাছে হেঁটে ও উটে চড়ে আসবে।

হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এর আওয়াজ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষ শুনে ছিল।

(৮) وَكَذٰلِكَ نُرِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

অনুরূপ ভাবে আমি ইব্রাহীমকে আসমান সমুহ এবং জমীনের বাদশাহী দেখায়েছি, এবং তা এ জন্য যে তিনি যেন দৃঢ় আস্থাশীলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এর চোখে এমন দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন যে তিনি জমীনের সর্বনিম্ন অংশ থেকে সর্বোচ্চ আরশ পর্যন্ত দেখেছেন। কেননা ওনাকে আল্লাহর সমস্ত বাদশাহী দেখায়েছেন। প্রত্যেক জায়গায়তো আল্লাহর বাদশাহী রয়েছে।

(৯) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ

আপনি কি দেখেন নি যে আপনার প্রভূ হাতীওয়ালাদের সাথে কি করেছেন?

pdf By Syed Mostafa Sakib

(١٠)اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

হে মাহবুর, আপনি দেখেননি যে আপনার প্রভূ আদ কউমের সাথে কি করেছেন?

নবী করীম(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আবির্ভাবের চল্লিশ দিন আগে হস্তিবাহিনী ধ্বংস হয়েছিল এবং আদ ও ছমুদ কউমের উপর আযাব এসেছিল হুযুরের আবির্ভাবের হাজার হাজার বছর আগে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঘটনা দুইটি না বোধক প্রশ্নের মাধ্যমে জোর দিয়ে বলেছেন الم تر। আপনিকি দেখেন নি? অর্থাৎ নিশ্চয় দেখেছেন। এতে বুঝা গেল নবীর দৃষ্টি শক্তি এত প্রখর যে বিগত-ভবিষ্যত সবকিছু দেখেন। এ জন্য হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মেরাজের রাতে দোযখে বিভিন্ন কউমকে আযাবে লিপ্ত দেখেছেন। অথচ ওদের আযাব কিয়ামতের পরেই হবে। এ জন্য আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান -

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ-

যেই আল্লাহ মহা পবিত্র, যিনি রাতারাতি তাঁর প্রিয় বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় নিয়ে যান, যার আশে পাশে আমি বরকত দিয়ে রেখেছি, যাতে আমি ওনাকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই সেই বান্দা শ্রবনকারী ও দর্শন কারী।

বুঝা গেল যে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আগে পরের ঘটনাবলী আল্লাহর সত্ত্বা ও গুনাবলী, কুদরতের নিদর্শন সমূহ সবকিছু দেখেছেন।

আপত্তি নং (১) ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) এর দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রানশক্তি যদি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে মিসরের অবস্থা জেনে নিয়েছিলেন, তাহলে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর বিরহে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কেন কাঁদতে ছিলেন? ওনার কান্না থেকে বুঝা যায় যে তিনি ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর ব্যাপারে বেখবর ছিলেন।

জবাবঃ এর সাদাসিদে জবাব হচ্ছে নবীগনের সমস্ত শক্তি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। তিনি যখন চাহেন তাদেরকে কোন দিকে মনোনিবেশ করান। আবার যখন চাহেন অমনোযাগী করে রাখেন। অজানা ও অমনোযোগী এক কথা নয়। বিশ্লেষন মূলক জবাব হচ্ছে ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) এর ক্রন্দনটা ছিল আল্লাহর প্রেমে। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ছিলেন বাহ্যিক উপলক্ষ মাত্র। কৃত্রিমতা হচ্ছে বাস্তবতার

সেতু। নতুবা তিনি ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। স্বয়ং কুরআন করীম ওনার কিছু কথাকে এভাবে উদ্বৃত করেছেন, যদ্বারা বুঝা যায় যে তিনি সব কিছু জানতেন। ফরমান-

(١) قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ- يٰبَنِىَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ

আমি আমার পেরেশানী ও দুঃখের ফরিয়াদ আল্লাহর কাছে করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই বিষয় সমূহ জানি, যা তোমরা জান না। হে আমার প্রিয় সন্তানগণ, যাও ইউসুফ ও ওর ভাইয়ের সন্ধান কর এবং আল্লাহ থেকে নৈরাশ হয়ো না।

(٢) عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا

শ্রীঘ্রই আল্লাহ তাআলা এ তিন জনকে (ইয়াহুদা, বিন ইয়ামিন ও ইউসুফ) আমার কাছে পৌছাবে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে ইউসুফের ভাইয়েরা বিন ইয়ামিনকে মিশরে রেখে এসেছিল। কিন্তু তিনি বলেন-ইউসুফ ও ওর ভাই বিন ইয়ামীনকে তালাশ কর অর্থাৎ ওরা দু'জন একই জায়গায় আছে।

দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা গেল যে দ্বিতীয় বার ইহুদা ও বিন ইয়ামিন মিসরে গিয়েছিল কিন্তু তিনি বলেন আল্লাহ তাআলা ঐ তিনজনকে আমার কাছে পৌছাবে। তৃতীয় জন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ছিল।

(٣) وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

হে ইউসুফ আল্লাহ তাআলা তোমাকে সে ভাবে নবুয়াতের জন্য মনোনিত করবেন এবং তোমাকে কথা সমূহের (স্বপ্নের) তাবীর শিক্ষা দিবেন।

ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) হযরত ইউসুফের একটি স্বপ্ন তাবীর করে বলে ছিলেন যে তুমি নবী হবে এবং তোমাকে স্বপ্ন তাবীরের জ্ঞান দান করবেন। তখনও সেই জ্ঞান প্রকাশ পায়নি কিন্তু তিনি (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) জানতেন যে এ স্বপ্ন সত্য এবং নিশ্চয় বাস্তবায়িত হবে।

আপত্তি নং (২) হযরত সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) বিলকিসের রাজ্যের খবর জানতেন না, হুদহুদ পাখী খবর দিয়েছিল। যেমন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَقِيْنٍ

আমি সেই জিনিস দেখে এসেছি, যা আপনি দেখেন নি এবং আমি আপনার কাছে সাবা থেকে সত্য খবর এনেছি!

এর জবাবে হযরত সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন-

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ

বললেন, আমি যাচাই করে দেখবো, তুমি কি সত্য বলেছ,নাকি মিথ্যুকদের অন্তর্ভূক্ত।

এখন প্রশ্ন হলো, যদি তিনি বিলকিসের রাজ্য সম্পর্কে অবহিত থাকতেন, তাহলে বিলকিসের কাছে চিঠি লিখে যাচাই কেন করলেন যে হুদহুদ সত্যবাদী, নাকি মিথ্যুক। এতে বুঝা গেল যে তিনি বিলকিস সম্পর্কে জানতেন না, হুদহুদই জানতো। প্রতীয়মান হলো যে নবীর জ্ঞান থেকে পশু পাখীর জ্ঞান অধিক হতে পারে। (দেওবন্দী-ওহাবী)

জবাব ঃ এ আয়াত সমূহে আল্লাহ তাআলা কোথাও বলেন নি যে সুলাইমান আলাইহিস সালামের জ্ঞান ছিল না। হুদহুদ পাখীও এ রকম বলেনি যে আপনি বিলকিসের খবর জানেন না। বরং বলেছিল اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ

আমি সেই জিনিস দেখে এসছি, যা আপনি দেখেননি অর্থাৎ আপনি ওখানে জাননি এবং দেখেননি। এটা কোথা থেকে জানা গেল যে তিনি অনবহিত ছিলেন। যদি অনবহিত থাকতেন, তাহলে যখন আসফকে বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন, তখন আসফ বলেনি-হুযুর আমি সেই জায়গা দেখিনি, চিনিনা এবং সিংহাসন কোথায় আছে তাও জানি না, আপনি হুদহুদকে আমার সাথে দিন, সে রাস্তা দেখায়ে দিলে আমি নিয়ে আসবো বরং কারো কাছে রাস্তা ঠিকানা জিজ্ঞাস না করে মূহুর্তের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে আসলো। যদি সেই সিংহাসন ওনার দৃষ্টি সীমার মধ্যে না থাকতো, তাহলে কিভাবে নিয়ে আসলো। তাই যখন আসফের দৃষ্টি থেকে সিংহাসন লুকায়িত নয়, তখন হযরত সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) এর দৃষ্টি থেকে কি করে লুকায়িত হবে। কিন্তু প্রত্যেক কাজের একটি সময় ও সহায়ক বিষয় থাকে। বিলকিসের ঈমান আনার সময় সেটাই ছিল, এবং হুদহুদকে এ কাজের সহায়ক করাটা খোদার হুকুম ছিল, যাতে জানা যায়, নবীগণের দরবারের পশুপাখীরাও লোকদের ঈমান নসীব হওয়ার সহায়ক।

হযরত সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) এর যাচাই করাটা অজানার দলীল নয়। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সমস্ত বান্দার আমলসমূহ যাচাই করে রায় দিবেন। তাহলে কি আল্লাহকেও অনবহিত বলতে হবে?

মাসআলা নং ৫

মৃত ব্যক্তিগন শুনেন এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাগন মৃত্যুর পরেও সাহায্য করেন

এ মাসআলার বিশ্লেষন প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে। এটা মুসলমানদের সর্বসম্মত আকীদা বা বিশ্বাস যে মৃত ব্যক্তিগণ শুনেন এবং জীবিতদের অবস্থাদি দেখেন। নিম্নে এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলো। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

(১) فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ-

সালেহ (আলাইহিস সালাম) এর কউমকে ভূমিকম্প আক্রান্ত করলো। সকাল বেলা দেখা গেল যে ওরা নিজ নিজ ঘরে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। অত:পর সালেহ (আলাইহিস সালাম) ওদের থেকে মুখ ফিরায়ে নিলেন এবং বললেন, হে আমার কউম, আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভূর পয়গাম পৌছায়ে দিয়েছি এবং তোমাদের শুভ কামনা করেছি কিন্তু তোমরা শুভাকাঙ্খীদেরকে পছন্দ করতে না।

(২) فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ

অতপর শোয়াইব (আলাইহিস সালাম) সেই মৃতদের থেকে মুখ ফিরায়ে নিলেন এবং বললেন, হে আমার কউম, আমি তোমদের কাছে আমার প্রভূর পয়গাম পৌছায়ে দিয়েছি। তোমাদেরকে নসীহত করেছি। তাই কি করে আমি কাফিরদের জন্য শোক প্রকাশ করি।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল যে সালেহ্ (আলাইহিস সালাম) ও সোয়াইব (আলাইহিস সালাম) ধ্বংস প্রাপ্ত কউমের সামনে দাঁড়িয়ে ওদেরকে এ কথাগুলো বলেছিলেন।

(৩) وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ

ঐসব রসূলগণ থেকে জিজ্ঞেস করুণ, যাদের আমি আপনার আগে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাঠিয়েছি, আমি কি রহমান ছাড়া অন্য খোদা নির্ধারণ করেছি, যাকে পূজা করা হবে।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যুগে আগের নবীগণের কেউ জীবিত ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহ বলছেন-মৃত্যু প্রাপ্ত রসূলগণের কাছে জিজ্ঞেস করুন, আমি শিরকের অনুমতি দেইনি। ওনাদের উম্মতেরা ওনাদের প্রতি অপবাদ দিয়ে বলে যে ওদের নবীগণ ওদেরকে শিরকের হুকুম দিয়েছেন। এখন কথা হলো, মৃতব্যক্তি না শুনলে জিজ্ঞেস করার অর্থ কি? বরং সেই ৩নং আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে বিশিষ্ট বুযুর্গগণকে মৃতব্যক্তিগন জবাবও দিয়ে থাকে এবং ওনারাও সেই জবাব শুনেন। এখনও কশফের অধিকারী ব্যক্তিগণ মৃতদের থেকে জিজ্ঞেস করে নেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদেরকে ডাক দিয়ে বলেছেন-বল, আমার সমস্ত ফরমান সত্য ছিল কিনা? ফারুকে আযম (রাদিআল্লহ আনহু) আরয করলেন, প্রানহীন দেহের সাথে আপনি কেন কথা বলছেন? হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন-ওরা তোমাদের থেকে বেশী শুনে। অন্য এক রেওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে দাফনের পর জীবিতরা যখন ফিরে আসে, তখন মৃতরা ওদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। এ জন্য আমরা নামাযে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে সালাম করি। খাবাররত, প্রস্রাবরত ও নিদ্রিত ব্যক্তিকে সালাম করা নিষেধ। কেননা তাঁরা উওর দিতে পারেনা। তাই যে জবাব দিতে পারেনা, ওকে সালাম করা নিষেধ। যদি মৃত ব্যক্তি না শুনতো, তাহলে কবরস্থান দিয়ে যাবার সময় কবরবাসীকে এবং নামাযে হুযুরকে সালাম করা যেত না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ জীবদ্দশায় মানুষের শ্রবন শক্তি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কেউ নিকট থেকে শুনে, যেমন সাধারন লোক এবং কেউ দূর থেকে শুনে ফেলেন, যেমন নবী ও ওলীগণ। মৃত্যুর পর এ ক্ষমতা কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। তাই সাধারন মৃত লোকদেরকে ওদের কবরস্থানে গিয়ে ডাকলে শুনে কিন্তু দূর থেকে শুনেনা। তবে ওফাত প্রাপ্ত নবী-ওলীগণকে দূর থেকে ডাকলেও শুনেন। কেননা তাঁরা জীবদ্দশায় দূর থেকে শুনতেন। তাই ওফাতের পরও নিশ্চয়ই শুনবেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে যে কোন জায়গা থেকে সালাম পেশ করতে পারেন। কিন্তু অন্যলোকদের বেলায় দূর থেকে নয়। কেবল কবর স্থানে গিয়ে সালাম পেশ করতে হবে।

মৃত্যুর পর রূহ যদিও নির্ধারিত জায়গায় থাকে। কিন্তু এর সম্পর্ক নিশ্চয়ই কবরের সাথে থাকে। সাধারন লোকদেরকে কবরস্থানে গিয়ে ডাকলে শুনবে কিন্তু অন্য জায়গা থেকে ডাকলে শুনবে না। যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তির একটি রূহ (রূহে সায়রানী) শরীর

থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে ভ্রমন করে। কিন্তু ওর শরীরের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলে শুনবে, অন্য জায়গা থেকে ডাকলে শুনবে না।

আপত্তি ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে নামাযে ও অন্যান্য সময় যে সালাম করা হয়, সেটাতে যেন এ নিয়ত করা না হয় যে তিনি শুনছেন। বরং কারো মাধ্যমে যে রকম সালাম পাঠানো হয়, বা কাউকে চিঠিতে যে রকম সালাম লেখা হয়, সে রকম সালামই যেন মনে করা হয়। কেননা দূরের লোকের সালাম ফিরিশতাগণ পৌছান এবং কাছের লোকের সালাম হুযুর নিজে শুনেন। হাদীছ শরীফে এ রকমই বর্ণিত আছে। (ওহাবী)

জবাব ঃ এর কয়েকটি জবাব আছে। এক, এটাতো ওদের আকীদার বিপরীত। কেননা ওরা বলে যে মৃত ব্যক্তি শুনেইনা এবং এর সমর্থনে কুরআনের আয়াত পেশ করে। যদি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) রওযা মুবারক থেকে শুনতে পান, তাহলে সেটাওতো ওদের কথার বিপরীত হয়ে গেল। দুই, যখন কারো মাধ্যমে সালাম পাঠানো হয়, তখন আস্‌সালামু আলাইকুম বলা হয় না বরং বলা হয় যে আমার সালাম বলিও। আমরা নামাযে ও অন্যান্য সময়ে হুযূরকে চিঠিতো লিখি না। তবে ওদের কথা মত ফিরিশতাগণের মাধ্যমে প্রেরন করি। এমতাবস্থায়, 'হে নবী আপনার উপর সালাম' এ রকম বলা যায় না বরং এ রকমই বলা উচিৎ 'হে ফিরিশতাগণ, হুযূরকে আমাদের সালাম বলবেন।' নামাযে কি আমরা এ রকম বলি?

তিন, ওদের উল্লেখিত হাদীছে এটা নেই যে হুযূর দূরের সালাম শুনেন না। সেখানে কেবল এটা বর্ণিত আছে দূরের সালাম ফিরিশতাগণ পেশ করেন। হতে পারে, ফিরিশতাগণও পেশ করেন এবং হুযূর নিজেও শুনেন। যেমন ফিরিশতাগণ বান্দার আমলসমূহ আল্লাহর কাছে পেশ করেন। তাহলে কি আল্লাহ তাআলা ওদের আমলের কথা নিজে জানেন না? নিশ্চয়ই জানেন, তবে পেশও করেন।

আপত্তি ঃ মৃত ব্যক্তিরা শুনে না। আল্লাহ পাক কুরআন করীমে ইরশাদ করেন-

(১) وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ

তুমি কবর বাসীদেরকে শুনাতে পারবেনা-

(২) اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَاتُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ وَمَا اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ

তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারবে না এবং না পারবে তোমার আহবান বধিরদেরকে শুনাতে, যখন ওরা পিঠ দেখায়ে ফিরে যায় এবং পারবে না অন্ধদেরকে বিপদগামী থেকে পথে আনতে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ আয়াত সমূহে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে কবরবাসী ও মৃতগণ শুনেনা।

জবাব ঃ এ আপত্তির কয়েকটি জবাব আছে।

এক, ওরাও স্বীকার করে যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রাওজা পাকে গিয়ে যে সালাম পেশ করা হয়, সেটা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শুনেন। সেটাও তাহলে এ আয়াতের বিপরীত হলো।

দুই, এ আয়াতে এটাও উল্লোখিত আছে যে তুমি অন্ধদেরকে গোমরাহী থেকে ফিরাতে পারবেনা। অথচ হুযূরের বরকতে হাজার হাজার অন্ধ হেদায়েতের পথে এসেছে।

তিন, এখানে কবরবাসী, মৃতব্যক্তি, অন্ধ ও বধির দ্বারা ওসব কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের উপর মোহর পড়ে গেছে, যাদের ঈমান আনার সম্ভাবনা নেই। একথা স্বয়ং কুরআনই বলছেন। যেমন ওদের উল্লেখিত আয়াতের শেষে এটা বর্ণিত আছে-

(১) إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

তুমি শুনাতে চাইলে ওদেরকে শুনাও, যায়া আমার আয়াত সমূহের উপর ঈমান আনে এবং ওরা মুসলমান।

এ কথাটি সুরা নমল ও সুরা রোম-দুই জায়গায় বর্ণিত আছে। যদি ওখানে অন্ধ, বধির, মৃত বলতে সত্যিকার অন্ধ, বধির ও মৃত ব্যক্তি বুঝাতো ,তাহলে ওগুলোর মুকাবিলায় ঈমান ও ইসলামের কথা কেন বর্ণিত হলো? এতে বুঝা যায় এর দ্বারা অন্তরের অন্ধ, অন্তরের মৃত বলা হয়েছে। ওদেরকে মৃত অন্ধ এ জন্য বলা হয়েছে যে মৃতকে সৎপথে আহবান করার দ্বারা যেমন কোন উপকার হয় না, এবং কোন নসীহত ফলপ্রসূ হয়না, এ লোকগুলোও তেমন। কুরআন করীম কাফিরদের সম্পর্কে ইরশাদ ফরমান-

(২) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

এ কাফিরেরা বধির, গোংগা ও অন্ধ। অতএব তারা ফিরবে না।

(৩) أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

সে যে মৃত ছিল আমি ওকে জীবিত করে দিয়েছি এবং ওর জন্য এমন এক আলোর ব্যবস্থা করেছি, যদ্বারা সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে,সে রকম হবে, যে গভীর অন্ধকারে আছে, সেখান থেকে বের হওয়ার ইচ্ছুক নয়। এভাবে

কাফিরদের চোখে ওদের আমলসমূহ শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতে মৃত বলতে কাফির, জিন্দেগী বলতে হেদায়েত, অন্ধকার বলতে কুফর এবং আলো বলতে ঈমান বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত ওদের উপস্থাপিত আয়াত সমূহের তফসীর।

(৪) وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

যে এ দুনিয়াতে অন্ধ, সে আখেরাতেও অন্ধ এবং পথভ্রষ্ট।

এ আয়াতেও অন্ধ বলতে চোখের অন্ধ নয়, মনের অন্ধ বুঝানো হয়েছে। যাহোক যে সব আয়াতে অন্ধ, মৃত, বধিরের না শুনার ও হেদায়েত প্রাপ্ত না হওয়ার কথা বর্ণিত আছে, ওখানে সেসব শব্দ দ্বারা কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তিতো শুধু শুনে না বরং সাহায্যও করতে পারে। যেমন কালামে পাকে বর্ণিত আছে ঃ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ-

সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তাআলা নবীগণের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে যখন আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করবো অতপর তোমাদের কাছে রসুল তশরীফ আনবেন, যিনি তোমাদের কিতাব সমূহ সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা যেন ওনার প্রতি ঈমান আন এবং ওনার সাহায্য কর।

এ আয়াত থেকে বুঝা পেল যে আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীগণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে ওনারা যেন মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উপর ঈমান আনেন এবং ওনার সাহায্য করেন। অথচ ওনারা তাঁর যুগে ছিলেন ওফাতপ্রাপ্ত। তাই বুঝা গেল যে ওনারা ওফাতের পরও হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উপর ঈমানও এনেছেন এবং রূহানি সাহায্যও করেছেন। যেমন সমস্ত নবীগণ মেরাজের রাতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে নামায পড়েছেন। এটা সেই ঈমান আনার প্রমান। বিদায় হজ্বে অনেক নবী হুযুরের সাথে হজ্বে অংশ গ্রহণ করেছেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) মুসলমানদের বড় সাহায্য করেছেন। তিনি পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযকে পাঁচ ওয়াক্ত করায়ে দিয়েছেন। শেষ যুগে ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করার জন্য আসবেন। এতে বুঝা যায় মৃত্যগণ সাহায্য করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا-

যদি এসব লোকেরা নিজেদের প্রতি জুলুম করে আপনার কাছে আসে, অত:পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসূলও ওদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেন, তাহলে আল্লাহকে মেহেরবান তওবা কবুল কারী হিসেবে পাবে।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাহায্যে তওবা কবুল হয়। এ সাহায্য পার্থিব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত এ সাহায্য অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ ওফাতের পরও হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাহায্যে আমাদের তওবা কবুল হবে। অতএব ওফাতের পর সাহায্য প্রমানিত হলো। এ জন্য এখনও হাজীদেরকে বলা হয় যে মদীনা মনোয়ারায় সালাম পেশ করার সময় যেন উপরোক্ত আয়াতটি পড়া হয়। যদি এ আয়াত কেবল জীবন কালের জন্য নির্দিষ্ট হতো, তাহলে এখন ওখানে হাযির হওয়ার এবং সেই আয়াত পড়ার নির্দেশ কেন? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

আমি আপনাকে সারা জাহানের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরন করেছি।

এতে বুঝা গেল যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সমস্ত জগতের জন্য রহমত। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওফাতের পরও এ জগত বলবৎ রয়েছে। যদি তাঁর রহমত যদি এখনও বলবৎ না থাকে, তাহলেতো পৃথিবী রহমত থেকে খালি হয়ে গেছে। আরও ইরশাদ ফরমান-

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

আমি আপনাকে সমস্ত লোকের জন্য সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি।

এখানে লোক বলতে ওসব লোকও অন্তর্ভূক্ত, যারা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওফাতের পরে আসবে এবং তাঁর এ সাহায্য কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

وَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ-

এ বনি ইসলাঈলেরা কাফিরদের মুকাবিলায় সেই রসূলের নাম নিয়ে জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করতো। পরে যখন ওরা জানলো যে সেই রসূল ওদের

কাছে এসেছেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করে বসলো।

বুঝা গেল যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আগমনের আগেও তাঁর নাম নিয়ে প্রার্থনা করা হতো এবং কামিয়াবী হাসিল করতো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দুনিয়াতে আসার আগেও যখন তাঁর সাহায্য কার্যকর ছিল, তাহলে পরেও নিশ্চয়ই বলবৎ থাকবে। এজন্যই আজও মুসলমানেরা হুযূরের নামের কলেমা পড়ে, দরূদ শরীফ দ্বারা বিপদ আপদ দূরীভূত করে এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর তাবারুকাত দ্বারা উপকৃত হয়। মূসা (আলাইহিস সালাম) এর তাবরুকাত দ্বারা বনী ইসরাঈলেরা যুদ্ধসমূহে জয়লাভ করতো। এ সব হচ্ছে ওফাতের পরের সাহায্য। তবে আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এখনও বাস্তব জীবন নিয়ে জীবিত আছেন। মাত্র মুহূর্তের জন্য মৃত্যু ঘটে ছিল। অত:পর তাঁকে স্থায়ী জিন্দেগী প্রদান করা হয় । কুরআন করীমেতো শহীদগণের জীবিত থাকার কথাও ঘোষনা করা হয়েছে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জীবিত থাকার প্রমান হচ্ছে- জীবিতদের জন্য বলা হয় অমুক হলেন আলিম, অমুক হলেন হাফেজ, অমুক হলেন কাজী এবং মৃতদের বেলায় বলা হয়- অমুক আলেম ছিলেন, অমুক হাফেজ ছিলেন। জীবিতদের জন্য 'হলো' এবং মৃতদের জন্য 'ছিল' ব্যবহৃত হয়। সাহাবীগন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জিন্দেগীতে যে কলেমা পাঠ করতেন, সেই কলেমা কিয়ামত পর্যন্ত পাঠ করা হবে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল। সাহাবীগণ ও বলতেন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল গুনাহগারদের সুপারিশকারী, সমস্ত জগতের রহমত। আমরাও এ রকমই বলে থাকি। যদি তিনি জীবিত না হতেন, তাহলে আমাদের কলেমা পরিবর্তন হওয়া বাঞ্চনীয় ছিল। আমরা কলেমা এভাবে পড়তাম-হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল ছিলেন'। যখন এ কলেমার পরিবর্তন হয়নি, তখন বুঝতে হবে যে তাঁর কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জীবিত থাকা কালীন সময়ের মত সবের সাহায্য করেন। তবে এ জিন্দেগী সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি নেই।

মাসআলা নং ৬

নেয়ামত প্রাপ্তির ঐতিহাসিক তারিখ সমূহ পালন করা ও এতে আনন্দ প্রকাশ করা।

যে তারিখে বা যে দিনে আল্লাহর কোন নেয়ামত পাওয়া যায়, সে তারিখ বা দিন কিয়ামত পর্যন্ত মর্যাদাবান হয়ে যায়। ঐ তারিখের স্মরণে আনন্দ উৎসব করা, খুশীতে ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

pdf By Syed Mostafa Sakib

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

রমযান সেই মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ- لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

নিশ্চয়ই আমি কুরআন মজিদ কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। কদরের রাত সম্পর্কে আপনার কি ধারনা? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

এ আয়াত সমূহ থেকে বুঝা গেল যে কদরের রাত ও রমযান মাসের এত মর্যাদা যে কদরের রাত হাজার মাস থেকে উত্তম এবং রমযান মাস অন্যান্য মাসসমূহ থেকে উত্তম। এ মাসের নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এটা ছাড়া অন্যান্য মাসের নাম কুরআনে বর্নিত হয়নি। তা একমাত্র এ জন্য যে এ মাস ও এ রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনতো একবারই অবতীর্ণ হলো। কিন্তু এ মাস ও এ রাত সব সময়ের জন্য মর্যাদাবান হয়ে গেল। কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে-

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

আপনার প্রভূর নেয়ামতের খুবই চর্চা কর।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ-

বলে দিন, আল্লাহর ফজল ও রহমতের উপর খুবই খুশী উদযাপন কর। সেটা ওদের ধন দৌলত থেকে উত্তম।

এ আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা গেল যে, যে তারিখে আল্লাহর নেয়ামত পাওয়া গেছে, সেটার স্মরণে যেন আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ-

হে মূসা, বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর সে দিন সমূহের কথা স্মরণ করায়ে দাও; যে দিন সমূহে ওদের নেয়ামত সমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। নিশ্চয়ই এ দিনসমূহে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে।

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ-

মরিয়মের পুত্র ঈসা আরয করলেন, হে আল্লাহ, আমাদের জন্য আসমান

হতে খাদ্যে ভরপুর দস্তরখানা অবতীর্ণ কর। সেটা যেন আমাদের আগে পরের সকলের জন্য ঈদ হয় এবং তাহার পক্ষ থেকে স্মরনীয় নিদর্শন হয়।

এ আয়াত সমূহ থেকে জানা গেল যে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেয়া হয় যে বনী ইসরাঈলকে নেয়ামত প্রাপ্তির তারিখ সমূহ যেন স্মরণ করায়ে দেন এবং যথাযথভাবে সেই দিবসসমূহ উদ্‌যাপন করে। হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) অদৃশ্য থেকে খাদ্য ভর্তি দস্তরখানা আসার তারিখকে তাঁর আগে পরের সমস্ত ঈসায়ীদের জন্য ঈদ সাব্যস্ত করেছেন। তাই মীলাদ শরীফ, গেয়ারবী শরীফ, বুজুগানে কিয়ামের ওরস, ফাতিহা, চল্লিশা ইত্যাদি সবই জায়েয। কেননা এগুলো আল্লাহর নেয়ামতের স্মরণ। আর এ স্মরনীয় দিনসমুহ পালন করা হলো কুরআনী নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যেটা তোমাদের কাছে আছে।

আপত্তি নং ১ ঃ মুসালিম ও বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে জুমাবার রোযা রেখো না। কোন কোন রেওয়ায়তে বর্নিত আছে-জুমাবারকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট কর না। এতে বুঝা যায় দিন তারিখ নির্ধারণ নিষেধ। যেহেতু মীলাদুনবী ও ওরসে তারিখ নির্ধারণ করা হয়, সেহেতু ওগুলো নিষেধ। (ওহাবী)

জবাব ঃ এর জবাব সেই হাদীছে রয়েছে যে যদি এমন কোন তারিখে জুমাবার হয়, যে তারিখে তুমি রোযা রেখে থাকো, তাহলে রোযা রেখ। অর্থাৎ যদি কারো ১২ তারিখে রোযা রাখার নিয়ম হয়ে থাকে এবং ঘটনাক্রমে যদি কোন মাসের বার তারিখ শুক্রবার হয়ে যায়, তাহলে রোযা রেখে নাও। তাছাড়া নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আরও ইরশাদ করেছেন কেবল জুমবার রোযা রেখ না বরং আগে বা পরে আরও একদিন মিলায়ে নাও। এতে বুঝা গেল তারিখ নির্ধারন করা নিষেধ নয় বরং জুমা বারের একক রোযাই নিষেধ করা হয়েছে। তবে নিষেধাজ্ঞার কারণ অন্যকিছু। এ সম্পর্কে ওলামায়ে কিরাম অনেক কারণ বর্ণনা করেছেন-

এক, জুমাবার মুসলমানদের জন্য ঈদ স্বরূপ এবং ঈদের দিন রোযা নিষেধ হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিতে সেদিনের রোযা নিষেধ। অর্থাৎ জুমাবারটা ঈদের দিনের সাথে তুলনীয়। দুই, জুমার দিন হচ্ছে কাজকর্মের দিন, যথা গোসল করা, কাপড় ধোয়া, জুমার জন্য তৈরী হওয়া, খোতবা শুনা, জুমার নামায পড়া ইত্যাদি। সম্ভবত: ঐ সব কাজ করতে রোযার কারণে কষ্ট হতে পারে। তাই রোযা রাখা বারন করা হয়েছে। যেমন হাজীদের জন্য নয় তারিখে ও কোরবানীর দিনে রোযা এবং কোরবানী ঈদের নামায পড়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

মকরূহ। কেননা ঐ দিন গুলো ওদের কাজের দিন। রোযার কারণে ওদের কাজে ব্যাঘাত হবে। তিন, জুমার দিন রোযা রাখার মধ্যে ইহুদীদের সাথে সামঞ্জস্য প্রকাশ পায়। ওরা শুধু সপ্তাহের দিন রোযা রাখে। তাই তোমরা জুমার দিন রোযা রাখতে চাইলে আগে পরের একদিন মিলায়ে নাও, যাতে সাদৃশ্য না থাকে। চার, স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে সোমবারের রোযাটা কেমন? ইরশাদ ফরমান-ঐ দিন আমার জন্মদিন, ঐদিন ওহী নাযিল শুরু হয়েছিল। সুতরাং রোযা রেখো। স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আশুরার রোযা সেই আনন্দে রেখেছেন যে ঐ তারিখে মূসা (আলাইহিস সালাম) ফেরাউন থেকে নাজাত পান।

স্মরনীয় দিন উদযাপন যদি মন্দ হতো, তাহলে এ দিন গুলো কেন পালন করা হতো।

আপত্তি নং ২ ঃ যেহেতু মীলাদ শরীফ ও ওরসে অনেক শরীয়ত বিরোধী কাজ হয়ে থাকে, তাই এগুলো নিষেধ।

জবাব ঃ যুক্তিটাই ভুল। কোন সুন্নত কাজ হারাম কাজের সংমিশ্রনে নাজায়েয হয়ে যায় না। যেমন বিবাহ হচ্ছে সুন্নাত। কিন্তু ইদানিং লোকেরা এতে অনেক শরীয়ত বিরোধী কাজের সংমিশ্রন ঘটায়েছে। তাই বলে বিবাহকে বাঁধা দেয়া যায়না বরং ওসব শরীয়ত বিরোধী কাজ সমূহ প্রতিরোধ করা চায়।

মাসআলা নং ৭

বুজুর্গানে কিয়ামের আস্তানার তাযীম

যে জায়গায় কোন ওলী বসবাস করেন বা করে ছিলেন বা কোন সময় অবস্থান করে ছিলেন, সে জায়গাটি সম্মানিত। ওখানে ইবাদত ও দুআ অধিক কবুল হয়ে থাকে। সেই জায়গার তাযীম করা ও সেখানে দুআ প্রার্থনা করা উচিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

(১) وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ

স্মরণ কর, যখন আমি বললাম-তোমরা এ বস্তিতে প্রবেশ কর এবং সেখানে বিনা বাঁধায় যা খুশী,তা খুব খাও এবং দরজায় সিজদা করে প্রবেশ কর আর বল-আমাদের গুনাহ মাফ হোক। আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেব এবং

নেককারদেরকে আরও অধিক দেব।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে যখন বনী ইসরাঈলের তওবা কবুল হওয়ার সময় আসলো, তখন তাদেরকে বলা হলো বায়তুল মুকাদ্দসের দরজায় সিজদা করে প্রবেশ কর এবং গুনাহ মাফ চাও। বায়তুল মুকাদ্দস হচ্ছে নবীগণের আবাসিক এলাকা। এর তাযীম করানোর জন্য বলা হলো সিজদা করে যাও এবং তথায় গিয়ে তওবা কর।

(২) وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا

যে এ মক্কায় প্রবেশ করলো, সে নিরাপদ হয়ে গেল।

(৩) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ

তারা কি এটা দেখেনি যে আমি হেরম শরীফকে নিরাপদ স্থান করেছি এবং এর আশে পাশে লোকেরা লুঠতরাজ করতো। তারা কি বাতিলের উপর ঈমান আনে এবং আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে?

এ সব আয়াত থেকে বুঝা যায় যে হযরত খলীলুল্লাহের আবাস্থল পবিত্র মক্কানগরী অনেক সম্মানিত ও মর্যাদাবান।

(৪) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

সেখানে (মরিয়মের কামরায়) যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) দুআ প্রার্থনা করলেন- হে প্রভূ, আমাকে তোমার পক্ষ থেকে পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয় তুমি দুআ শ্রবণকারী।

(৫) قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا

যারা এ বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করলো, তারা বললো-আমরা আসহাবে কাহাফের উপর মসজিদ নির্মান করবো।

এ আয়াতসমুহ থেকে বুঝা গেল যে হযরত যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) পাশে দাঁড়িয়ে সন্তানের দুআ প্রার্থনা করেছেন। যাতে ওলীর সান্নিধ্যের কারণে দুআ কবুল হয়। মুসলমানগণ আসহাবে কাহাফের গুহার মুখে মসজিদ তৈরী করেছেন, যাতে ওনাদের বরকতে অধিক হারে দুআ কবুল হয়।

(৬) لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ

আমি কসম করছি এ মক্কা শহরের, যেহেতু হে মাহবুব, আপনি এ শহরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তশরীফ রেখেছেন।

(৭)وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ

ডুমুর, যায়তুন, সিনাইপাহাড় এবং বিশ্বস্ত শহরের কসম।

এ আয়াত গুলো থেকে বুঝা গেল, যে জায়গায় আল্লাহর প্রিয় বান্দা রয়েছে, সে জায়গা এমন সম্মানিত হয়ে যায় যে আল্লাহ যেই জায়গার নাম নিয়ে কসম করেন।

এ আয়াত সমূহ থেকে এটা জানা গেল যে বুজুগানে কিয়ামের আস্তানা যেখানে ওনারা ইবাদত করেছেন, ওখানে গিয়ে নামায পড়া দুআ প্রার্থনা করা, সে জায়গার তাজীম করা ছওয়াবের কাজ। এ জন্যই মদীনা মনোয়ারায় এক ইবাদতের ছওয়াব পঞ্চাশ হাজার এবং মক্কা মুকাররমায় একের ছওয়াব এক লাখ। কেন জানেন? এ জায়গা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের। রেলগাড়ী যদিওবা সমস্ত লাইন দিয়ে চলে, কিন্তু পাওয়া যায় কেবল ষ্টেশনে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের আস্তানা খোদার রহমতের ষ্টেশন।

মাসআলা নং ৮

সত্য মাযহাবের পরিচয়

ইসলামে আজ অনেক ফেরকা রয়েছে এবং প্রত্যেক ফেরকাই নিজ নিজ ফেরকাকে হক বলে দাবী করে। আবার প্রত্যেকেই কুরআনের দ্বারা নিজ নিজ মাযহাব প্রমানের চেষ্টা করে। কুরআনকে জিজ্ঞেস করুন সত্য মাযহাব কোন্‌টি? কুরআন ইরশাদ ফরমান-

(১) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

হে মুসলমানগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থেকো।

(২) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

আমাদেরকে সরল পথের হেদায়েত দাও। ওদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।

(৩) اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

এরা হচ্ছে ওসব লোক, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন। তাই তোমরা ওনাদের পথেই চল।

(৪) قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ

ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) এর সন্তানেরা বললো, আমরা আপনার মাবুদ

ও আপনার পূর্ব পুরুষ-ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের মাবুদের ইবাদত করবো।

(৫) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

(৬) قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا

বলে দিন, আমরা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এর দীনের অনুসরণ করবো, যেটা সকল খারাবী থেকে মুক্ত।

(৭) وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا

হক সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যে রসূলের বিরোধীতা করে এবং মুসলমানদের পথকে এড়িয়ে চলে, আমি ওকে ওর অবস্থার উপর ছেড়ে দেব এবং ওকে দোযখে প্রবেশ করাবো। সেটা কত যে মন্দ ঠিকানা।

(৮) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত করেছি, যাতে তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষী হও এবং এ রসূল তোমাদের জন্য দয়ালু সাক্ষী হন।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল যে সত্য মযহাবের পরিচয় দু'টি- এক, এ মযহাবে সত্য লোক অর্থাৎ আল্লাহর ওলী, নেক বান্দা ও হক্কানী আলেমগণের অবস্থান, দুই, এ মযহাব অধিকাংশ মুমিনগণের মযহাব। ছোট ছোট ফেরকা, যে গুলোতে ওলী ও নেকবান্দাগণ নেই, সেগুলো ভ্রান্তপথ। এ আয়াতের তফসীর হলো সেই হাদীছ, যেটাতে বর্ণিত আছে اِتَّبِعُوْا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ (বড় দলের অনুসরণ কর) অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যে মযহাবের উপর অধিকাংশ মুসলমান আছে, সেটা গ্রহন কর। এ দুটি আলামত আজ শুধু মযহাবে আহলে সুন্নাতের মধ্যে পাওয়া যায়। কাদিয়ানী, শিয়া, ওহাবী, দেওবন্দী ও চকড়ালবী ফেরকার মধ্যে কোন সময় আল্লাহর ওলী ছিল না, এখনও নেই। সমস্ত চিশ্‌তী, কাদেরী, সরওয়ার্দী ও নক্সবন্দী বুজুর্গানে কিয়াম এ সুন্নী মযহাবে এসেছেন এবং এখনও আছেন।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর তাযীম করা তাঁর কাছে অভাব-অভিযোগ কামনা করা, তাঁকে অদৃশ্য জ্ঞানী বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি বিষয়ে অধিকাংশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসলমানদের বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিশ্লেষন আমার 'জাআল হক' কিতাবে রয়েছে।

প্রত্যেক ফেরকার ইতিহাস সেটার নাম থেকে বুঝা যায়। ফেরকাগুলোর বর্তমান নামগুলো হলো ঐতিহাসিক। ফেরকাগুলো সম্পর্কে আমি কিছু আলোকপাত করছিঃ

মিরজায়ী ঃ এ ফেরকার জন্ম মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী থেকে হয়েছে। তাই এ ফেরকার বয়স একশ বছরের মত হবে।

চকড়ালবী ঃ এ ফেরকার জন্ম আবদুল্লাহ চকড়ালবী পাঞ্জাবীর সময় থেকে হয়েছে। তাই এর বয়সও একশ বছরের অধিক হবে।

ইসনা আশারা শিয়া ঃ এ ফেরকার জন্ম বার ইমামের সময় থেকে হয়েছে। কেননা ইসনা আশারার অর্থ বার ইমাম। বার ইমাম জন্ম হওয়ার পর এ ফেরকার আবির্ভাব ঘটে। তাই এর বয়স আনুমানিক এগারশ বছরের মত হবে অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর তিনশ বছরের পর এ ফেরকার জন্ম।

জেনে রাখা দরকার যে এ শিয়া ফেরকার আকীদা হচ্ছে ইমাম মাহদীর জন্ম হয়ে গেছে। তিনি কুরআন নিয়ে আত্মগোপন করেছেন। কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে আত্মপ্রকাশ করবেন।

ওহাবী ঃ ওহাবী-দেওবন্দী বা লামযহাবী ফেরকার জন্ম আবদুল ওহাব নজদীর সময় থেকে হয়েছে। তাই এর বয়স প্রায় দু'শ বছরের মত হবে।

বাবী-বাহায়ী ঃ এ দু'ফেরকার জন্ম বাহাউল্লাহ ও আবদুল্লাহ বারের যুগে হয়েছে। তাই এ ফেরকাদ্বয়ের বয়স একশ বছর থেকেও কম।

আ গ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতঃ যখন থেকে সুন্নাতে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দুনিয়াতে প্রকাশ পেয়েছে, তখন থেকে এ মযহাবের আগমন ঘটে। অর্থাৎ সুন্নাতে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বয়সই এ মযহাবের বয়স। যেহেতু এ মাযহাব রসূলের সুন্নাত ভিত্তিক এবং অধিকাংশ মুসলমানদের মাযহাব, সেহেতু এ মযহাবের নামকরণ হয়েছে-আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।

কুরআন শরীফের আলোচিত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল যে এ দল অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতই হক। যদিওবা কুরআন পাকের তরজুমা সবাই করে, হাদীছ নিয়েও সবাই কথা বলে এবং সব ফেরকাতে আলেমও আছে কিন্তু সালেকীন অর্থাৎ আওলীয়ায়ে কামেল, হুযুর গাউছে পাক, খাজা আজমীর, খাজা বাহাউদ্দীন নক্সবন্দী, শেখ শাহাবুদ্দীন সরওয়ার্দী প্রমূখ অতীতের ওলীগণ এবং বর্তমান যুগের

ওলীগণ এবং বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য আস্তানার নেক বান্দাগণ এ মযহাবে আছেন। তাই আলোচিত আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে এ মযহাবই হক। আল্লাহ তাআলা যেন আমরা সবাইকে এ মযহাবেই অটল রাখেন এবং এ মযহাবেই যেন আমাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটে। আমীন-

মাসআলা নং ৯

তাবিজ-দুআ-ঝাড়ফুঁক

কতেক লোক সুফিগণের তাবিজ-দুআ, ঝাড় ফূঁককে অবিশ্বাস করে এবং বলে যে এগুলো পয়সা কামানোর ঢং। কুরআন করীমে এর কোন প্রমান নেই, বরং ফুঁকের সময় যে বায়ু পেট থেকে বের হয়, সেটা গরম ও দুষিত হয়ে থাকে। তাই সেই ফুঁক আরোগ্য নয়, বরং রোগাক্রান্ত করবে। কিন্তু এ ধারনা কুরআনের বিপরীত।

কুরআন করীম দম করা ও ফুঁকের কার্যকারিতার কথা ঘোষনা করেছেন। যেমন-

(১) وَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ

আল্লাহ তাআলা বললেন, যখন আমি আদমের শরীর গঠন করবো এবং সেটার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দেব তখন তোমরা যেন তাঁর জন্য সিজদায় পতিত হও।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে আল্লাহ তাআলা রূহ ফুঁকে আদম (আলাইহিস সালাম) কে জীবন দান করেন। আল্লাহ তাআলার ফুঁকটা ছিল তার শান মুতাবেক। কিন্তু ফুঁক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রানকে রূহ এ জন্য বলা হয় যে সেটা ফুঁকে প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে 'রূহ' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো ফুঁক।

(২) وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ

আল্লাহ তাআলা ইমরানের কন্যা মরিয়মের কথা বর্ণনা করেন, যিনি স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাজত করেছিলেন। অত:পর আমি আমার পক্ষ থেকে ওর মধ্যে রূহ ফুঁকে দি এবং সে স্বীয় প্রভূর বানীসমূহ ও কিতাবসমূহ সত্যায়ন করেছে এবং অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) বুকে ফুঁক দিলেন, যার ফলে হযরত মরিয়ম গর্ভবতী হন এবং ঈসা (আলাইহিস সালাম) জন্ম গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁর লকব হয়েছে রূহল্লাহ ও কলেমাতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দম বা

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহর কলেমা। হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) কিছু পড়ে মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) এর উপর ফুঁক দিয়েছেন, যার ফলে এ ফয়েজপ্রাপ্ত হলেন। আজও রোগ শোক ইত্যাদি থেকে আরোগ্যের জন্য কিছু পড়ে ফুঁক দেয়া হয়।

(৩) اِنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ

ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেন, আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করছি। অত:পর তাতে ফুঁক দিচ্ছি। আল্লাহর হুকুমে সেটা জীবিত পাখী হয়ে যাবে। আমি আল্লাহর হুকুমে কুষ্ঠরোগী ও অন্ধকে ভাল করি এবং মৃতকে জীবিত করি।

এতে বুঝা গেল যে ঈসা (আলাইহিস সালাম) ফুঁক দিয়ে মৃতকে জীবিত করতেন, কুষ্ঠ রোগী ও অন্ধকে আরোগ্য করতেন। এখানেও ফুঁকের ফয়েজের কথা বর্ণিত হয়েছে।

(৪) وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ

যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন আসমান জমীনে যারা থাকবে বেহুশ হয়ে যাবে।

(৫) يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا

যে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন তোমরা দলে দলে আসবে।

বুঝা গেল যে কিয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে,যার ফলে মৃত ব্যক্তিরা জীবিত হবে। মোট কথা, শুরু, শেষ, বেচে থাকা সবই ফুঁক দ্বারা হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। এ জন্য আজও সুফিয়ানে কিরাম কুরআন করীম থেকে কিছু পড়ে ফুঁক দেন। স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরাম রোগীদের উপর কুরআন মজিদ থেকে পড়ে ফুঁক দিতেন। কারণ যেমনি ফুলের স্পর্শিত বাতাসে সুগন্ধ সৃষ্টি হয়, তেমনি যে মুখে কুরআন পড়া হয়েছে, মুখ স্পর্শ করে যে হাওয়া বের হবে, সেটা নিশ্চয় শেফাদায়ক হবে। অনুরূপ তাবরুকাত দ্বারা শেফা পাওয়া যায়। যেমন এ অধ্যায়ের শুরুতে কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমানিত করা হয়েছে।

মাসআলা নং ১০

সকল সাহাবাই বরহক

কুরআন করীম সাহাবায়ে কিরামের বরহক ও সত্যতার কথা ঘোষনা করেছেন। যেমন,

(১) الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

সেই উচ্চ মর্যাদাবান কিতাবে (কুরআন) সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আল্লাহতাআলা ঘোষনা করেছেন যে কুরআনে কোন সন্দেহ বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। চার ধরণের সন্দেহের অবকাশ আছে। (১) হয়তো প্রেরনকারী ভুল করতে পারে, কিংবা (২) বাহক ভুল করতে পারে, কিংবা (৩) যার কাছে এসেছে, তিনি ভুল করতে পারে, অথবা (৪) যারা শুনে লোকদের কাছে পৌছায়েছেন, তাঁরা সততার সাথে কাজ করেননি। যদি এ চার স্তরে কুরআন নিরাপদ থাকে, তাহলে সন্দেহের কোন সুযোগ নেই। কুরআন শরীফ প্রেরনকারী হলেন আল্লাহ, আনয়ন কারী হলেন জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম), গ্রহন কারী হলেন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং হুযুর থেকে শুনে আমাদের কাছে প্রচারকারী হলেন সাহাবীগণ। যদি কুরআন শরীফ আল্লাহ তাআলা, জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) ও নবী করীম(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত মাহফুজ থাকে, কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম যদি সত্যবাদী না হয় যাদের মারফত কুরআন শরীফ আমাদের কাছে পৌছেছে, তাহলে কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকে। কেননা ফাসেকের কথা নির্ভরযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান। اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا (যদি তোমাদের কাছে ফাসিক ব্যক্তি কোন খবর আনে, তাহলে যাচাই বাচাই কর) এ রকম হলে কুরআনের উপরও আস্থা থাকবে না। কুরআনের উপর আস্থা তখনই হতে পারে, যখন সাহাবায়ে কিরামের তকওয়া ও সততার উপর আস্থা থাকে।

(২) هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

কুরআন ওসব মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত, যারা গায়েবের উপর ঈমান আনে।

অর্থাৎ হে কাফিরেরা যে সব পরহিজগার তথা সাহাবায়ে কিরামকে তোমরা দেখতেছ তাদেরকে কুরআনই হেদায়েত দান করেছে এবং তাঁরা কুরআনেরই হেদায়েত দ্বারা এ রকম উচ্চ স্তরের মুত্তাকী হয়েছেন, কুরআন করীমই তাদের স্বভাব চরিত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিবর্তন করে দিয়েছে। কুরআন করীমের সার্থকতা দেখতে চাইলে, সাহাবায়ে কিরামের তকওয়া দেখুন। এ আয়াতে কুরআন শরীফ সাহাবায়ে কিরামের ঈমান ও তকওয়াকে তাদের সত্যতার দলীল হিসেবে পেশ করেছে। যদি ওনাদের মধ্যে ঈমান ও তকওয়া না থাকে, তাহলে কুরআনের দাবী প্রমানহীন হয়ে গেল।

(৩) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا- لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ-

যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা রসূলকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারা সাচ্চা মুসলমান। তাঁদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি।

এ আয়াতে সাহাবায়ে কিরাম, মুহাজির ও আনসারের নাম উল্লেখ করে ওনাদেরকে সাচ্চা মুমিন, মুত্তাকী ও ক্ষমা প্রাপ্ত বলা হয়েছে।

(৪) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ-

ওসব গরীব মুহাজিরগণ, যাদেরকে ঘর ও সম্পদ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, যারা আল্লাহর ফজল ও রেজামন্দি কামনা করে এবং আল্লাহ ও রসূলের সাহায্য করে, তারাই সত্যবাদী।

এ আয়াতে সমস্ত মুহাজির সাহাবীগণের নাম ঠিকানা উল্লেখ করে সত্যবাদী বলা হয়েছে অর্থাৎ এরা ঈমান, আমল ও কথায় অনড়।

(৫) وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

যারা আগে থেকেই এ শহরে ও এ ধর্মে অবস্থান করে নিয়েছে, ওদেরকে ভালবেসেছে, যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে, যে জিনিস দিয়ে দেয়া হয়েছে, সেটার জন্য তাদের মনে কোন অভাব বোধ নেই, যারা নিজেদের জীবনের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে যদিওবা তারা খুবই অভাবী, এবং

যারা নিজের নফ্সের কৃপনতা হতে রক্ষা পেয়েছে, তারাই সফলকাম হয়েছে।

এ আয়াতে মদীনার আনসারদের কথা উল্লেখ করে তাঁদেরকে সফলকাম বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় সমস্ত আনসার ও মুহাজির সাচ্চা ঈমানদার ও সফলকাম ছিলেন।

(৬) لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ- اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

তোমাদের মধ্যে কেউ ওদের বরাবর নয়, যারা মক্কা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তারা মর্যাদায় ওদের থেকে বড়, যারা মক্কা বিজয়ের পর ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। অবশ্য আল্লাহ তাআলা ওনারা সকলের সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। তবে মক্কা বিজয়ের আগে যে খোলাফায়ে রাশেদীন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম) এর জন্য জান কুরআন ছিলেন, ওনারা অনেক বড় মর্যাদার অধিকারী । তাঁদের স্তরে পৌছার কেউ কল্পনাও করতে পারেনা। কেননা আল্লাহ তাআলা এ বিশাল দুনিয়াকে বলেছেন কলীল (ছোট) এবং এত বড় আরশকে বলেছেন আজীম(বড়) কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদাকে বলেছেন আজম (অনেক বড়)।

(৭) وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى- وَلَسَوْفَ يَرْضٰى

সে সবচে বড় পরহিজগার, যে পবিত্র হওয়ার জন্য নিজের মাল দান করে এবং ওর উপর কারো কোন অনুগ্রহ নেই যার বদলা দেয়া যায়। কেবল স্বীয় প্রভূর সন্তুষ্টি কামনা করে। নিশ্চয়ই অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে, তাকে দোযখ থেকে অনেক দূরে রাখা হবে।

এ আয়াতটি হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শানে নাযিল হয়েছে। যখন তিনি হযরত বেলাল (রাদি আল্লাহু আনহু) কে অধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করলেন এবং আযাদ করে দিলেন, তখন কাফিরেরা বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, সম্ভবত তাঁর প্রতি বেলালের কোন অবদান আছে, যার প্রতিদানে ওকে এত অধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। কাফিরদের সেই ধারনার খন্ডনে এ আয়াত নাযিল করা হয়েছে। এ আয়াতে ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর নিম্নলিখিত বিশেষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

গুনাবলীর কথা বর্ণিত হয়েছে :

✳ দোযখ থেকে অনেক দূরে থাকা

✳ সবচে বড় মুক্তাকী হওয়া

✳ তার পবিত্র আমল সমূহ অকৃত্রিম ও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হওয়া।

✳ বেহেশতে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন নেয়ামত সমূহ লাভ করা, যেটাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

সুক্ষ্ম কথা ঃ আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম) এর বেলায় বলেছেন- وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى (আপনাকে আপনার প্রভূ একটুকু দিবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।) এবং হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বেলায় বলেছেন وَلَسَوْفَ يَرْضٰى (অচিরেই ছিদ্দিকে আকবর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে) এতে প্রতীয়মান হয় যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম) এর সাথে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা আছে।

(৯) يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

হে নবী, আপনার জন্য আল্লাহ এবং আপনার অনুসারী এ মুমিন যথেষ্ট।

এ আয়াত হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ঈমান আনার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, আপনার জন্য মূলত: আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট এবং পার্থিব বিষয় সমূহে ওমরই যথেষ্ট।

(১০) اَلَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ (الاية)

যারা নবীর সাথী, তারা কাফিরদের জন্য কঠোর, পরস্পরের জন্য নরম।

(১১) ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ .....

তারাই হচ্ছে সেই সাহাবীবর্গ, যাদের তুলনা তৌরিত ও ইনজিল কিতাবে সেই ক্ষেতের সাথে দেয়া হয়েছে, যেটা স্বীয় শিষ বের করেছে, ... যেন ওদের দ্বারা কাফিরদের মনে আগুন লাগে।

এ আয়াতের সার কথা হচ্ছে-হে মাহবুব আমি তোমার সাহাবীদের জয়গান তৌরিত ও ইনজিলে করেছি। ওরাতো আমার শস্য শ্যামল ক্ষেত, ওদেরকে দেখে আমি তুষ্ট হই

আর আমার দুশমন (রাফেজীরা) জ্বলে পুড়ে মরে।

সুক্ষ্ম কথা ঃ কুরআন করীম কতেক লোকের বেলায় সুস্পষ্টভাবে কুফরীর ফত্ওয়া দিয়েছেন-এক, নবীর মানহানিকারীদের বেলায়, দুই, সাহাবায়ে কিরামের দুশমনদের বেলায়। সাহাবায়ে কিরামের দুশমনদের বেলায় কুফরীর ফত্ওয়া অন্য কারো দ্বারা নয় স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজেই দিয়েছেন।

(১২) ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَاتَحْزَنْ

আবুবকর দু'জনের দ্বিতীয় জন, যখন তাঁরা গুহার ছিলেন, রসূল যখন তাঁর সাথীকে বল ছিলেন- চিন্তা কর না।

এ আয়াত হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শানে নাজিল হয়েছে। এতে তখনকার সেই ঘটনার কথা বর্নিত হয়েছে যে যখন প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম) কে নিয়ে গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং বাধ্য হয়ে সাপের দ্বারা নিজেকে দংশন করালেন। এ আয়াতে হযরত আবুবকর ছিদ্দিকের সাহাবী হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষনা দেয়া হয়েছে। তিনি যে সাহাবী এটা আল্লাহর একত্ব ও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম) এর নবুয়াতের মত অকাট্য ও নিশ্চিত। কেননা যে কুরআন তাওহীদ ও রেসালতের সুস্পষ্ট ঘোষনা দিয়েছেন সেই কুরআন ছিদ্দিকে আকবরকে সাহাবী হওয়ার ঘোষনা দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর ন্যায় নিষ্ঠা এবং তিনি যে সাহাবী সেটার ব্যাপারে ঈমান আনা আল্লাহ তাআলার তাওহীদের উপর ঈমান আনার মত আবশ্যক এবং তাঁকে সাহাবী হিসেবে অস্বীকার করাটা তওহীদ ও নবুয়াতকে অস্বীকার করার মত ধর্মহীনতার পরিচালক।

(১৩) وَلَاتَهِنُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

হতাশ হয়ো না, চিন্তাযুক্ত হয়ো না। তোমরাই শ্রেষ্ঠ, যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হয়ে থেকো ।

(১৪) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا-

আল্লাহ তাআলা ওদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন, যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে। নিশ্চয় ওদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দিয়েছেন, এবং নিশ্চয় ওদের জন্য ওদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেই দীনকে স্থায়ী করে দিবেন, যেটা ওদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং নিশ্চয় ওদের পুর্বের ভয়কে শান্তিতে পরিবর্তন করে দিবেন।

এ দু'আয়াতে মুসলমানদের সাথে দুটি শর্তে কয়েকটি ওয়াদা করা হয়েছে। শর্তদ্বয় হচ্ছে-ঈমান ও তকওয়া এবং ওদের সাথে ওয়াদা হচ্ছে-উচ্চ মর্যাদা, খেলাফত প্রদান, ভয়ের পর শান্তি দান, দীনকে মজবুদ করন। ঠিকই আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কিরামকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন পৃথিবীতে, খেলাফত করারও সৌভাগ্য দান করেছেন, শান্তিও দান করেছেন। ওনাদের যুগে দীনকে এমন স্থায়ী ও মজবুত করে দিয়েছেন, সেই মজবুতির কারণে ইসলাম এখনও অটল আছে। ওনারাও শর্ত দুটি পূরণ করেছিলেন। অন্যথায় এ চার নেয়ামত ওনাদেরকে দেয়া হতো না।

এ কয়েকটি আয়াত নমুনা হিসেবে পেশ করা হলো। ওনাদের ফযায়েল সম্পর্কে কুরআন শরীফে অনেক আয়াত আছে। থাকবেইনা কেন? ওনারা হচ্ছেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম) এর কামালিয়াতের বিকাশক। যেমন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম) এর সত্ত্বা আল্লাহর কামালিয়াতের নমুনা। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম) এর অবমূল্যায়ন মানে আল্লাহর কামালিয়াতের অস্বীকার। অনুরূপ সাহাবায়ে কিরামের অবমূল্যায়ন মানে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম) এর কামালিয়াতের অস্বীকার। ওস্তাদের বিদ্যার দৌড় সাগরিদের বিদ্যার্জন দ্বারা বুঝা যায়। যদি প্রথম কাতারের নামায ফাসেদ হয়, পিছনের কাতার সমূহের নামায সঠিক হতে পারেনা। কেননা ইমামকে প্রথম কাতারের নামাযীরাই দেখে থাকে। যদি ইঞ্জিনের সংশ্লিষ্ট পিছনের বগী ইঞ্জিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে পিছনের অপরাপর বগীগুলো চলতে পারেনা।সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন ইসলামের প্রথম সারির লোক, আমরা হলাম পিছনের সারির লোক। ওনারা হচ্ছেন গাড়ীর আগের বগী আর আমরা হলাম পিছনের বগী। যদি ওনারা সত্যিকার ঈমানদার না হয়ে থাকে, তাহলে আমরা কি করে মুমিন হতে পারি।

আপত্তি নং ১ ঃ ওসব আয়াত নাযিল হওয়ার সময় ওনারা সবাই ,মুমিন ছিলেন। কিন্তু হুযূরের তিরোধানের পর নাহক খেলাফত দখল ও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম) এর মীরাছ বন্টন না করার কারণে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। এ আয়াতগুলো আগের, পরবতী সময়ের সাথে ওগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।

জবাব ঃ এ আপত্তির কয়েকটি জবাব আছে ঃ

এক, আল্লাহ তাআলা সর্বময় অদৃশ্য জ্ঞানী। যদি খোলাফায়ে রাশেদীনের পরিনতি ভাল না হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা কুরআন মজিদে ওনাদের ফযীলত বর্ননা করতেন না। তাছাড়া ওনাদের প্রসঙ্গে উপরে উল্লেখিত আয়াতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে ওনারা দোযখ থেকে অনেক দূরে থাকবেন, ওনাদেরকে আল্লাহ তাআলা এতটুকু দিবেন যে এতে ওনারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং আল্লাহ তাআলা ওনাদের সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। এসব কিছু ভাল পরিনতির কারণেই প্রাপ্য।

দুই, ওনারা যদি ঈমান ত্যাগ করতেন, তাহলে পবিত্র আহলে বায়ত বিশেষ করে হযরত আলী মরতুজা (রাদি আল্লাহু আনহু) ওনাদের হাতে বায়াত করতেন না। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম) এর খলিফা তিনিই হতে পারেন, যিনি মুমিন মুত্তাকী। হযরত আলী মরতুজা (রাদি আল্লাহু আনহু) সিফ্ফিনে যুদ্ধ করেছেন এবং ইমাম হোমাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) কারবালা ময়দানে জান দিয়েছেন কিন্তু ইয়াযিদের হাতে বায়াত করেননি। তখনও সে রকম কিছু হলে ওনারা যুদ্ধ করতেন।

তিন, ছিদ্দিকে আকবর, ফারুকে আযম ও ওসমান গনী (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর পর ওনাদের খেলাফত মিরাছ হিসেবে ওনাদের সন্তানেরা পায়নি। বরং যার বেলায় সবাই একমত হয়েছেন, তিনিই খলীফা হয়েছেন। এটা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম) বর্ণিত খেলাফতেরই অনুরূপ। নবীর খেলাফতে কারো উওরাধিকার বা মালিকানা ছিলনা। জনমতের ভিত্তিতে খলীফা মনোনিত করার কথা ছিল।

চার, সম্পদ নবীর মিরাছ নয় বরং জ্ঞানই নবীর মিরাছ। আল্লাহ তাআলা ফরমান- وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ (হযরত সুলাইমান উওরাধিকারী হয়েছেন হযরত দাউদের এবং বলেছেন, হে জনগণ, আমাকে পাখীর ভাষার জ্ঞান দেয়া হয়েছে।) দেখুন, দাউদ (আলাইহিস সালামের) এর অনেক ছেলে ছিল, কিন্তু উওরাধিকারী হয়েছেন কেবল সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)। তাও সম্পদের নয় বরং জ্ঞানের। এ জন্য নবীর বিবিগণও মিরাছ পাননি। হযরত আলী মরতুজা (রাদি আল্লাহু আনহু)ও স্বীয় খেলাফত কালে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম) এর মিরাজ বন্টন করেন নি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে হক কথা। অতএব তোমরা সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জন্ম আদম (আলাইহিস সালাম) এর জন্মের সাথে তুলনা করেছেন। আদম (আলাইহিস সালাম)কে যেমনি বিনা বীর্যে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি ঈসা (আলাইহিস সালাম) কেও সৃষ্টি করেছেন। হে ঈসায়ীগণ, যখন আদম (আলাইহিস সালাম) খোদার বেটা হলো না, ঈসা (আলাইহিস সালাম) কি করে খোদার বেটা হয়? যদি ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জন্ম সাধারন লোকদের মত স্বাভাবিক ভাবে হতো, তাহলে ওনাকে আদম (আলাইহিস সালাম) এর সাথে তুলনা করা হতো না।

(২) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا

মরিয়ম জিব্রাঈলকে বললো, কি করে আমার সন্তান হতে পাবে? আমাকেতো কোন পুরুষ স্পর্শও করেনি, এবং না আমি অসতী। জিব্রাঈল বললেন, এ রকম হবেই। তোমার প্রভু বলেছেন-এ কাজ আমার জন্য সহজ, আমি এ শিশুকে লোকদের জন্য নিদর্শন বানাবো এবং এটা আমার পক্ষ থেকে রহমত।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) সন্তান লাভের খবরে বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে পুরুষের সংশ্রর ছাড়া কি করে সন্তান জন্ম হতে পারে। ওনাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হলো যে এ শিশুর দ্বারা আল্লাহর কুদরতী ক্ষমতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। তাই এভাবে পিতাবিহীন জন্ম হবে। যদি ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জন্ম স্বাভাবিক ভাবে হতো, তাহলে বিস্ময় প্রকাশ করার কি ছিল এবং আল্লাহর নির্দশন বলারই বা কি ছিল?

(৩) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ- قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا

ওনাকে কোলে নিয়ে স্বীয় গৌত্রের কাছে আসলেন। গৌত্রের লোকেরা বললো, হে মরিয়ম তুমি খুবই খারাপ কাজ করেছ।

বুঝা গেল যে ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জন্ম হওয়ায় লোকেরা মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) এর উপর অপবাদ দিল। যদি তাঁর স্বামী থাকতো, তাহলে এ অপবাদের কি কারণ হতে পারে?

আপত্তি নং ২ ঃ সমস্ত সাহাবাকে মুত্তাকী পরহিজগার বলে দাবী করা হচ্ছে, অথচ কুরআন শরীফে ওদেরকে ফাসিক বলা হচ্ছে। যেমন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

হে মুমিনগন, যদি তোমাদের কাছে কোন ফাসিক কোন প্রকারের খবর আনে, সেটা যাচাই বাচাই কর।

সাহাবী ওলীদ-বিন আকবা এসে খবর দিলেন যে অমুক গৌত্র যাকাত দেয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়; যেখানে ওলীদকে ফাসিক বলা হয়েছে এবং ফাসিক মুত্তাকী হতে পারেনা।

জবাব ঃ এর দু'টি জবাব আছে ঃ

এক, এখানে ওনাকে ফাসিক বলা হয়নি বরং একটি কানুন বর্ননা করা হয়েছে যে কোন ফাসিক কোন খবর আনলে সেটা যাচাই বাচাই করে দেখ।

দুই, ঐ বিশেষ সময়ে ওনাকে ফাসিক গুনাহগার বলা হয়েছে। সাহাবী থেকে গুনাহ হতে পারে। ওনারা মাসুম নয়, তবে সেটার উপর অটল থাকেনা, তওবার তৌফিক হয়ে যায়। যেমন হযরত মায়েয যিনা করেছিলেন কিন্তু পরে এমন তওবা নসীব হয়, যা অকল্পনীয়।

মাসআলা নং ১১

পিতাবিহীন ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জন্ম

সমস্ত মুসলমানের অকীদা বা বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে যে হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)কে আল্লাহ তাআলা পিতাবিহীন সৃষ্টি করে স্বীয় কুদরতের নমুনা দেখায়েছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে কাদিয়ানীরা তা বিশ্বাস করেনা। তাদের দেখাদেখি কতেক আত্মভোলা মূর্খ মুসলমানও এ বিষয়টির অস্বীকারকারী হয়ে গেছে এবং কুরআনে এর কোন প্রমান নেই বলে দাবী করছে। অথচ কুরআন শরীফে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে তা বর্ণিত আছে। যেমন-

(১) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ- الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ

নিশ্চয় ঈসার উদাহরণ আল্লাহর কাছে আদমের মত। ওনাকে মাটি দ্বারা তৈরী করেছেন অত:পর ওনাকে বললো হয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। এটা

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪) فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا- قَالَ انِّى عَبْدُ اللّٰهِ

অত:পর মরিয়ম শিশুর দিকে ইঙ্গিত করলেন। ওরা বললো, আমরা কি করে কথা বলবো ওর সাথে, যে দোলনার শিশু। শিশু বললো, আমি আল্লাহর বান্দা।

এতে বুঝা গেল যে আল্লাহ তাআলা ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে শৈশবেই বাকশক্তি দান করেছেন এবং তিনি নিজেই আপন মায়ের পবিত্রতা ও আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা বর্ণনা করেছেন। যদি তাঁর জন্ম পিতার ঔরসে হতো, তাহলে এ মুজেযা ও সাক্ষ্যের প্রয়োজন ছিলনা।

(৫) اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ- اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ-

মরিয়মের পুত্র ঈসা আল্লাহর রসূল ও তাঁরই কলেমা এবং একটি রূহ, যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মরিয়মের কাছে পাঠিয়েছেন।

এ আয়াতে ঈসা (আলাইহিস সালাম)কে মরিয়মের পুত্র বলা হয়েছে। অথচ সন্তানের পরিচয় বাপের দিক দিয়ে হয়ে থাকে, মায়ের দিক দিয়ে নয়। তাঁর পিতা থাকলে নিশ্চয় বাপের দিকে ইঙ্গিত করা হতো। তাছাড়া কুরআন করীমে হযরত মরিয়ম ছাড়া কোন মহিলার নাম উল্লেখিত হয়নি এবং কারো জন্মের ঘটনা এমন বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়নি। যেহেতু তাঁর জন্ম আশ্চর্যজনক ভাবে কেবল মায়ের দ্বারাই হয়েছে, সেহেতু সেই মহিয়সী মহিলার নাম নেয়া হয়েছে এবং পূর্ণ এক রূকু ব্যাপী জন্মের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকন্তু ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে আল্লাহর কলেমা, আল্লাহর রূহ বলা হয়েছে। এর রহস্য হলো, তাঁর জন্ম এক কলেমার দ্বারা হয়েছে এবং কোন মাধ্যম ছাড়া তাঁর রূহের আগমন ঘটেছে।

(৬)وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

ঈসা (আলাইহিস সালাম) দোলনায় ও পরিপূর্ণ বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবেন এবং তিনি বিশেষ নেককারদের অন্তর্ভূক্ত হবেন।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে শৈশবে ও বৃদ্ধ বয়সে কথা বলাটা ঈসা আলাইহিস সালামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মুজেযা। শৈশবে কথা বলাটা এ জন্যই মুজেযা যে শিশুরা এ বয়সে কথা বলে না। আর বৃদ্ধ কালে কথা বলাটা তাঁর জন্য এ কারণে মুজেযা যে তিনি বৃদ্ধ হওয়ার আগে আসমানে চলে গেছেন। ওখান থেকে এসে বৃদ্ধাবস্থায় কথা

বলবেন।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা তাঁর পিতাবিহীন জন্ম হওয়ার বক্তব্যটা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হলো।

আপত্তি ঃ আল্লাহ তাআলার নিয়ম হচ্ছে তিনি মানুষ বরং সমস্ত প্রানীকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেন। এ নিয়মের বিপরীত অসম্ভব। তাই ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর ব্যতিক্রম জন্ম হওয়টাা অসম্ভব। আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ ফরমান-

(১) اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

নিশ্চয় আমি মানুষকে মা-বাপের সংমিশ্রন বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। আমি ওকে পরীক্ষা করে দেখেছি। আত:পর আমি ওকে শ্রবনকারী দর্শনকারী বানিয়ে দিয়েছি।

(২) وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا

তিনি সেই সত্ত্বা, যিনি পানি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তার বংশ ও শ্বশুর বাড়ী নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

(৩) وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ

আমি প্রতিটি প্রানী পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। তবুও কি তারা ঈমান আনবেনা?

(৪) فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

তোমরা কখনো আল্লাহর নিয়ম পরিবর্তনশীল পাবেনা।

(৫) وَلَاتَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا

তোমরা আমার নিয়মকে পরিবর্তনশীল পাবে না।

এ আয়াত সমূহ থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল- এক, সমস্ত মানুষ ও জীবজন্তুর সৃষ্টির নিয়ম হচ্ছে বীর্য থেকে তাদের জন্ম হওয়া। দুই, আল্লাহর এ নিয়মের পরিবর্তন অসম্ভব। যদি ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জন্ম বিনা পিতায় মেনে নেয়া হয়, তাহলে এ আয়াত সমূহের বিপরীত হবে।

জবাব ঃ এ আপত্তির দু'টি জবাব আছে- একটি হচ্ছে আক্রমনাত্মক, অপরটি হচ্ছে বিশ্লেষন মূলক। আক্রমনাত্মক জবাব হচ্ছে আদম (আলাইহিস সালাম) বীর্য ছাড়া জন্ম হয়েছেন, আমাদের মাথার উকুন, খাটের ছারপোকা, পেট ও ক্ষতস্থানের পোকা বীর্য ছাড়া দিন রাত সৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষাকালে বিভিন্ন ফলের মধ্যে পোকা হয়ে থাকে। বলুন, এগুলো নিয়মের বিপরীত কি করে হলো?

বিশ্লেষন মুলক জবাব হচ্ছে নবীগণের মুজেযা ও ওলীগনের কারামাত স্বয়ং আল্লাহরই বিধিবদ্ধ অবদান। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান হচ্ছে নবী ও ওলীগন থেকে আশ্চর্যজনক বিষয় সমুহ প্রকাশ পাবে। তাই তাঁর পিতাবিহীন জন্ম হওয়াটা সেই মুজেযার বিধানের অন্তর্ভূক্ত।

আপত্তিকারীদের উত্থাপিত আয়াত সমূহের ভাবার্থ হচ্ছে কোন মখলুক আল্লাহর নিয়মনীতিতে পরিবর্তন করতে পারেনা। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছে, তা করতে পারেন। মানুষের জন্ম বীর্য দ্বারা হওয়া নিয়ম আর ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জন্ম বিনা বীর্যে হওয়াটা হচ্ছে কুদরত। আমরা নিয়ম ও কুদরত উভটাকে মান্য করি। আমরা নিয়মের অধীন কিন্তু আল্লাহ নিয়মের অধীন নন। দেখুন, নিয়ম হচ্ছে - আগুন পুড়ে ফেলে। কিন্তু ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) কে পুড়েনি। এটা হলো কুদরত । আল্লাহ তাআলা ফরমান-

قُلْنَا يَانَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

আমি বললাম-হে আগুন, ইব্রাহীমের জন্য ঠান্ডা ও শান্তি দায়ক হয়ে যাও।

এ রকম সমস্ত মুজেযাই ব্যতিক্রম ধর্মী। আল্লাহ তাআলা সর্ব শক্তিমান ও চিরস্থায়ী। তিনি যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। তাঁর কুদরতকে অস্বীকার করা মানে নিজের ঈমান হারিয়ে ফেলা ।

আল্লাহ তাআলা আমরা সবাইকে যেন সে পথে পরিচালিত করেন, যেটা তাঁর নেক বান্দাদের পথ এবং এ যুগের হাওয়া থেকে যেন আমাদের ঈমানকে হেফাজত রাখেন। আমীন।

সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১।	জা'আল হক (১)	মুফ্‌তি আহমদ ইয়ার খান নঈমী
২।	জা'আল হক (২)	"
৩।	সালতানতে মুস্তাফা	"
৪।	আউলীয়া কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত	"
৫।	দরসুল কুরআন	"
৬।	ইলমুল কুরআন	"
৭।	অপব্যাখ্যার জবাব	"
৮।	হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাঃ)	"
৯।	ইসলামী জিন্দেগী	"
১০।	ঈমানের সঠিক বিশ্লেষণ	আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী
১১।	মাতা-পিতার হক	"
১২।	তাজিমী সিজদা	"
১৩।	পীর মুরীদ ও বায়আত	"
১৪।	বাহারে শরীয়ত	মুফ্‌তি মুহাম্মদ আমজাদ আলী
১৫।	কানুনে শরীয়ত	মুফ্‌তি শামসুদ্দীন আহমদ রিজভী
১৬।	কারবালা প্রান্তরে	আল্লামা শফি উকাড়বী
১৭।	যলযালা	আল্লামা আরশাদুল কাদেরী
১৮।	আমাদের প্রিয় নবী	আল্লামা আবেদ নিযামী
১৯।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (১)	আল্লামা আবুন নুর মুহাম্মদ বশীর
২০।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (২)	"
২১।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৩)	"
২২।	গ্রন্থ পরিচিতি	মুফ্‌তি আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী
২৩।	সাত মাসায়েলের সমাধান	হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী
২৪।	হামদে খোদা ও নাতে রসূল	মাওলানা মোহাম্মদ আলী
২৫।	খাজা গরীবে নেওয়াজ	মাওলানা আবদুর রশীদ
২৬।	মুমিন কে?	আল্লামা তাহেরুল কাদেরী

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬১৮৮৭৪

ইলমুল কুরআন

হাকীমুল উম্মত
মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।